আনন্দমেলা

২·০০

এই সংখ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের বড়গল্প

তারিণীখুড়ো ও ডুমনিগড়ের মানুষখেকো

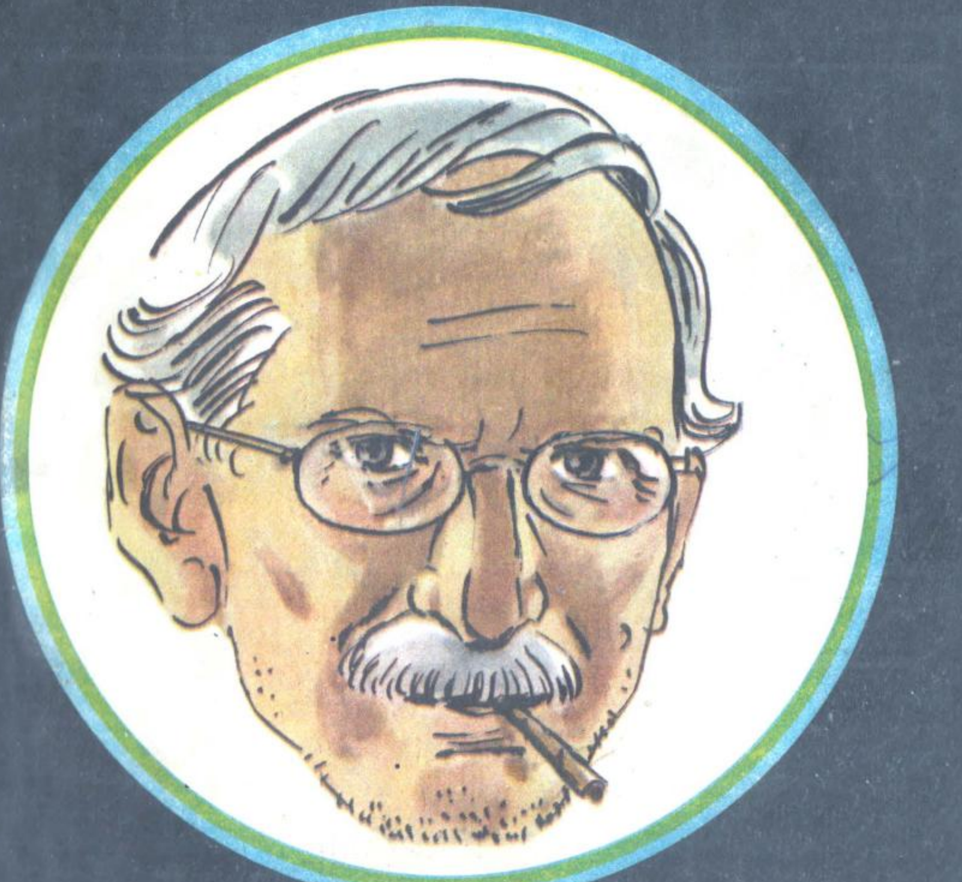

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

কোয়ালিটি সবার ওপরে....দাম সবার নীচে!

নিউট্রামূল—আমূলের অবদান ! অর্থাৎ সেরা গুণমান, এ একেবারে গ্যারান্টী ! গুণ-সমৃদ্ধ সুস্বাদু কোকো। পুষ্টিতে ভরপুর আমূল মিল্ক। বাছাই করা সেরা মল্ট। একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজপদার্থ। আর শক্তি বাড়িয়ে তোলার এমন সব গুণ—যার তুলনা নেই !

এত কিছু—অন্যের তুলনায় প্রায় ৪ টাকা কম দামে !

নিউট্রামূল "দাদা" হয়ে যান....আর বাকি পয়সা বাঁচান !

অন্যের তুলনায় প্রায় ৪ টাকা কম দামে !

নিউট্রামূলের মত অন্য পানীয়র সঙ্গে দামের তুলনা (টাকা)*
নন্ ক্ল্যাক্সিবল্ প্যাকেজিং

	৫০০গ্রাঃ	৮০০গ্রাঃ	১০০০গ্রাঃ
নিউট্রামূল টিন	১৩.৮৩	—	২৬.৬৭
মাল্টোভা বৈয়াম	১৭.৫৮	—	—
বোর্ণভিটা টিন	১৭.৬৮	২৬.৯৭	—
বুস্ট বৈয়াম	১৮.৮৭	—	—

*মার্চ ১৯৮১-র সর্বাধিক গ্রাহক-মূল্য। স্থানীয় কর আলাদা

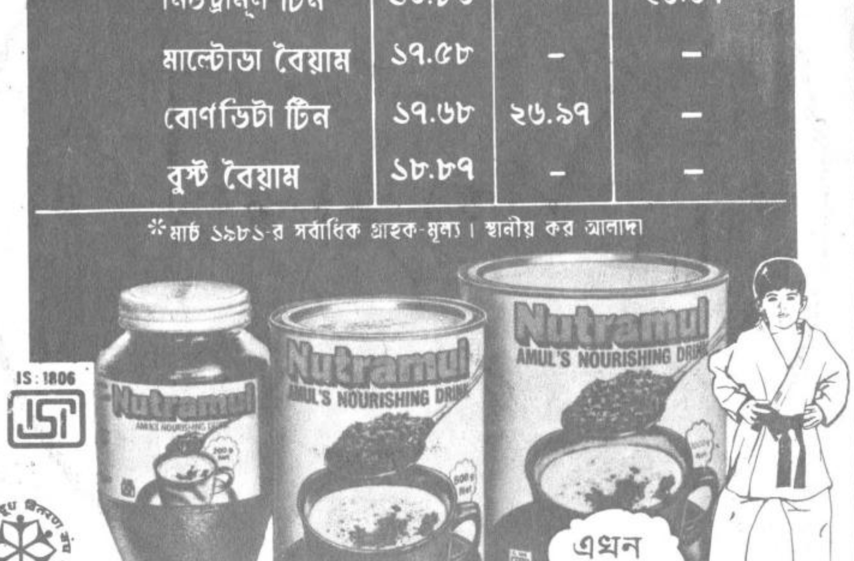

বাজারে ছেড়েছেন :
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড আনন্দ, ৩৮৮০০১.

আনন্দমেলা

২৯ পৌষ ১৩৮৮ ● ১৩ জানুয়ারি ১৯৮২ ● ৭ বর্ষ ● ২০ সংখ্যা

বড়গল্প
তারিণীখুড়ো ও ডুমনিগড়ের মানুষখেকো। সত্যজিৎ রায় ৪

জীবন-বিচিত্রা
হাতি-ধরিয়ে নায়ার । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৩৬

গল্প
অনন্যর অন্য পরীক্ষা । শ্রীধর সেনাপতি ১৮
অ্যালার্ম ঘড়ি । তারাপদ রায় ২১
মেজদা ও বুলফাইট । চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ৪৮

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ২৩

উপন্যাস
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫
সিসের আঙটি । বিমল কর ৫৫

ছড়া
হিমশিম । বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ১৭
কনের সাজ । জীবিতেশ চক্রবর্তী ১৯
হাওয়া-ভূত । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫২

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫৩

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো
সুনীল, ২৪ । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
ঢিমে তালে দ্বিতীয় টেস্ট । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৩
পাক-ভারত হকি । অশোক রায় ৪৪
জীরোর হীরো । প্রিয়দর্শী ৪৭
সুনীল গাভাসকারের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যা
(২৭ জানুয়ারি)

লেখাপড়া-সংখ্যা

হয়ে বার হচ্ছে। মাধ্যমিক-পরীক্ষার্থীরা এই সংখ্যাটি অবশ্যই সংগ্রহ করবে। কেননা, এতে পর্ষতের সেক্রেটারির অমূল্য নানা পরামর্শ ছাড়াও থাকছে

জয়েণ্ট এনট্রান্স

পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি বহু খবর, এবং সেইসঙ্গে সেরা কয়েকটি স্কুলের সেরা ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতির বিবরণ।

তা ছাড়া
নিয়মিত নানা বিভাগ এবং গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি তো থাকছেই

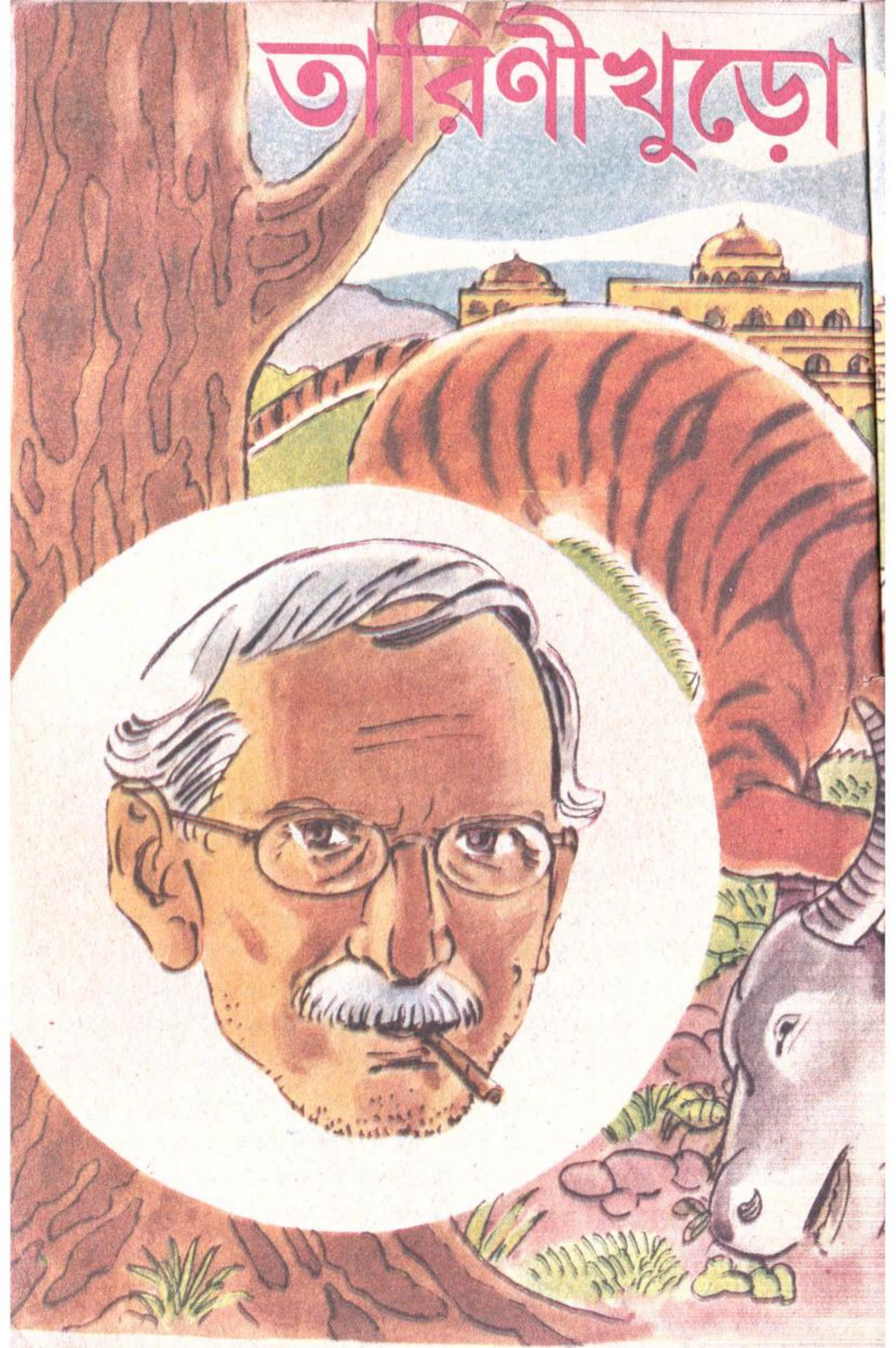
তারিণীখুড়ো

ও ডুমনিগড়ের মানুষখেকো

সত্যজিৎ রায়

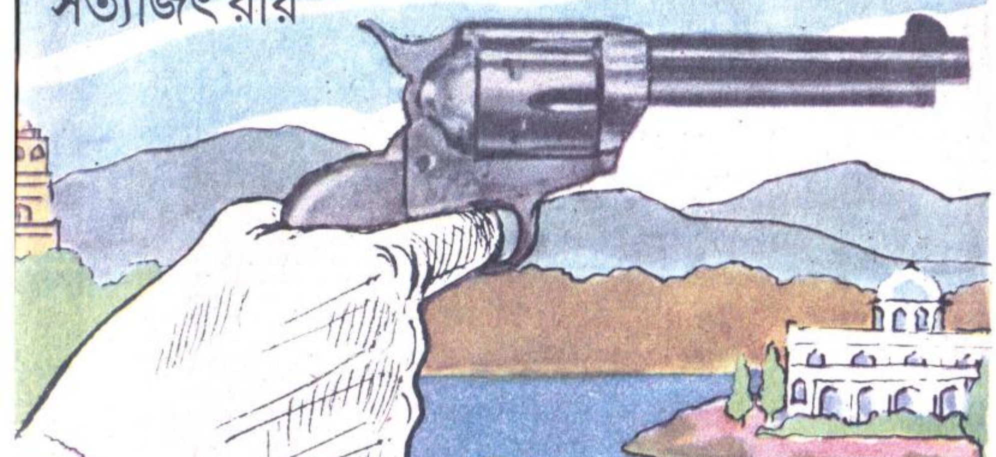

'আমি তখন ছিলাম ডুমনিগড় নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার,' বললেন তারিণীখুড়ো।

'ডুমনিগড় ম্যাপে আছে?' জিগ্যেস করল ন্যাপলা। ন্যাপলার মুখে কিছু আটকায় না।

'তোর কি ধারণা ম্যাপে যা আছে তার বাইরে আর কিছু নেই?' চোখ-নাক কুঁচকে বিস্ময় আর বিরক্তি দুটোই একসঙ্গে প্রকাশ করে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ম্যাপ তৈরি করে কারা? মানুষে ত! ভগবানের সৃষ্টিতে ডিফেক্ট থাকে জানিস? জোড়া মানুষ সায়ামীজ টুইন্‌সের কথা শুনিসনি? হাতে ছটা করে আঙুল, বাছুরের দুটো মাথা—এসব শুনিসনি? —ম্যাপে নেই ডুমনিগড়। এই নিয়ে ফিলিপ্‌সের অ্যাটলাস কোম্পানিকে কড়া চিঠি দিয়েছিলাম সেই

সময়। তারা লিখলে, ভেরি সরি, আগামী সংস্করণে শুধরে দেবে। দেয়নি যে, সেটা স্রেফ গাফিলতি। ডুমনিগড় হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বাঘেলখণ্ডে। মাইহার অবধি ট্রেন, তারপর একশো বত্রিশ কিলোমিটার পুবে গাড়িতে। হল ?'

ন্যাপলা চুপ মেরে গেল। আমরাও বাঁচলাম, কারণ তারিণীখুড়োর গপ্প শোনার আগ্রহ আমাদের সকলের সমান, ন্যাপলারও। খুড়ো আসলে আমাদের কেউ হন না, তবে খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ইনি মাঝে-মধ্যে আসেন আমাদের বাড়িতে। আমার জন্মের আগে বাবারা যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন তারিণীখুড়ো ছিলেন আমাদের পড়শি। তাই খুড়ো। বাবারও খুড়ো, আমাদেরও খুড়ো। খুড়ো ছাড়া আর ওঁকে কেউ কিছু বলে ব'লে জানি না। বাবার কাছেই শুনেছি যে, ভদ্রলোক নাকি চাকরির ধান্দায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিচিত্ররকম। কাজেই গল্পের স্টক অঢেল। খুড়ো বলেন যে, শুধু আর্টের খাতিরে যেটুকু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় সেটুকু ছাড়া নাকি সবই সত্যি।

গল্পের প্রথম লাইন বলে থেমে গেছেন খুড়ো, কারণ তাঁর ফরমাশ-মতো দুধ-চিনি ছাড়া চা এসে গেছে। এ-জিনিসটি একটু বেশি রসিয়ে-রসিয়ে খাচ্ছেন দেখে ন্যাপলা অধৈর্য হয়ে বলল, 'ডুমনিগড়ে হলটা কী ?'

'বলছি, বলছি,' বললেন তারিণীখুড়ো। এই র'টি খাওয়ার অভ্যাস আমার ডুমনিগড় থেকেই। রাজা ভূদেব সিং-এর হয়েছিল ডায়াবিটিস। এককালে সাত রঙের সাত রকম মিঠাই বরাদ্দ ছিল রোজ দুবেলা। তাছাড়া নিয়মিত মদ্যপান করতেন। আমার ডাক পড়ত সন্ধ্যাবেলা যেদিনই খুলতেন শঁপাঞ-এর বোতল।'

'শঁপাঞ ?' —নামটা আমাদের সকলের কাছেই নতুন।

'অশিক্ষিতরা যেটাকে বলে শ্যামপেন,' বললেন খুড়ো। 'যাই হোক, রাজা একদিনে সব পরিত্যাগ করেন। আমার চোখের সামনে ষোলো স্টোন থেকে সাড়ে ন' স্টোনে নেমে গেল ওজন। আর সেই সময়ই খুনটা হয়।'

'খুন ?'

আমাদের পাঁচজন শ্রোতার পাঁচ রকম গলায় একসঙ্গে উচ্চারিত হল প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ, খুন। রাজার তিন ছেলে—শ্রীপত, ভূপত আর অনুপ। ছোটটা রায়পুরে রাজকুমার কলেজে পড়ে, বড় দুটো পড়াশুনা শেষ ক'রে ডুমনিগড়েই থাকে। বড় শ্রীপতই হল খুন। শ্রীপতের ইয়ার ছিল নারায়ণ শ্রীমল। ধনী ব্যবসাদার ডুমনিগড়ের রাইস-কিং পুরুষোত্তম শ্রীমলের একমাত্র ছেলে। জুয়ার আড্ডা বসত নারায়ণের বাড়িতে। এক সন্ধ্যায় তুমুল বচসা হয় শ্রীপত আর নারায়ণে। প্রায় হাতাহাতি। শ্রীপত জিতছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা। সেই সময় নারায়ণের হাতে তার জোচ্চুরি ধরা পড়ে যায়। নারায়ণ শাসায় তাকে খতম করবে বলে।

'যাই হোক, খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল শ্রীপত। তখন রাত এগারোটা। হেঁটেই ফিরত। রাজবাড়ি থেকে শ্রীমলদের বাড়ি হাফ-এ-মাইল। পথে পড়ে রাম সরোবর। ভারী সুদৃশ্য লেক, ঠিক মধ্যিখানে একটি শ্বেতপাথরের মিনি-প্রাসাদ, নৌকো করে যাওয়া যায় সেখানে। সেই লেকের ধারে কে জানি রিভলভার দিয়ে গুলি করে শ্রীপতকে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেরেছে, এক গুলিতেই সাবাড়। পুলিশ নারায়ণকে সন্দেহ করে। সে যে শ্রীপতকে মারবে বলে শাসিয়েছে, সে-কথা জেরাতে আড্ডার সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নারায়ণ বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। আমি অবশ্য খুনের সময় কাছেই ছিলাম।'

'বলেন কী!' আবার পাঁচটা গলা একসঙ্গে।

'জোনাকি স্টাডি করছিলাম,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'সামনে দেওয়ালি—রাজাকে কথা দিয়েছিলাম পিদ্দিমের বদলে একটা নতুন ধরনের বাতির বন্দোবস্ত করব। ইলেকট্রিক নয়। কাঁচের টিউবের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম। রাজবাড়ির যত ব্যালকনি আর যত বারান্দা সব কটার আলসে আর রেলিঙের উপর টিউব বসানো থাকবে, আর তার মধ্যে ছাড়া থাকবে জোনাকি। অবিশ্যি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফুটো থাকবে টিউবে। নির্ঘাত চমকপ্রদ ব্যাপার হত, তবে বড়কুমারের মৃত্যুর জন্য সেবার আর কোনো ঘটা হয়নি দেওয়ালিতে।'

'আপনি খুনিকে দেখেছিলেন?' জিগ্যেস করল ন্যাপলা।

'না, দেখিনি। গুলি করেই সে পালায়। তবে খুনের খবরটা আমিই দিই। আমি যদি অন্যমনস্ক না থাকতাম তাহলে হয়ত খুনিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু সেটা হবার ছিল না। ফলে একটা জলজ্যান্ত অপরাধী চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেল।'

তারিণীখুড়ো বিড়ি ধরাতে থেমেছেন, আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, গল্প শেষ কিনা তাও বুঝতে পারছি না, এমন সময় খুড়ো আবার শুরু করলেন।

'এদিকে বড় ছেলের মৃত্যুতে রাজা আঘাত পেয়েছেন খুবই, আর তাতে অসুখও গেছে বেড়ে। এমন সময় একটা অন্য গণ্ডগোল দেখা দিল।

'খুনের মাসখানেক আগে দুই আমেরিকান এসেছিল-রাজার অতিথি হয়ে। আসল উদ্দেশ্য শিকার। ডুমনিগড়ের পূর্বদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, আর তার পাদদেশে গভীর জঙ্গল। যাকে বলে হাণ্টারস প্যারাডাইজ। বহু বিদেশী শিকারি ডুমনিগড়ে এসে শিকার করে গেছে, রাজা তাদের জন্য ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। বীটাররা বন পিটিয়ে কাঁসি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘ এনে ফেলে দিয়েছে শিকারিদের সামনে, আর তারা হাতির পিঠ থেকে শার্দূলসংহার করে খুশি মনে দেশে ফিরে গেছে।

'এইবার ওই দুই অ্যামেরিকানের একটি, নাম স্যাঙ্গার, চল্লিশ হাত দূর থেকে পর-পর দুটি গুলি মেরেও বাঘকে জখমের বেশি কিছু করতে পারল না। একটা গুলি লাগল ল্যাজে, একটা পিছনের পায়ের গোড়ালিতে। সেই বাঘ এখন হয়ে গেছে নরখাদক। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, তোরা জানিস বোধহয়। পুলাম্বি, হাড্ডা আর থুয়ারা—পাহাড়ের নীচে এই তিনটি গ্রাম থেকে সতেরোজন মেয়ে-পুরুষকে ধরে নিয়ে গেছে সেই বাঘ। গাঁয়ের লোকে রাজার কাছে এসে হত্যা দিয়েছে, ওই বাঘের শেষ না দেখা পর্যন্ত তাদের সোয়াস্তি নেই। বাঘের ভয়ে তারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না, সেই সুযোগে তাদের খেতের ফসল খেয়ে নিচ্ছে হরিণ আর শুয়োরের দল।

'রাজা ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, "ট্যারি,"—রাজা আমাকে ট্যারি বলেই ডাকতেন—"ট্যারি, এখন তুমিই ভরসা। এই ম্যানইটারের একটা বিহিত না করলেই নয়। তোমার কী লোকজন লাগবে বলো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ো।"

'এখানে বলা দরকার যে, মেজোকুমার ভূপত সিং-ও শিকারে সিদ্ধহস্ত। তেইশ বছর বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই বড় বাঘ ছোট বাঘ মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিয়াত্তর। তবে এটা জানি যে, রাজা মেজোকুমারের খুব একটা ভক্ত নন, কারণ সে অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছেলে। তাছাড়া মদ জিনিসটাকে একটু বেশিরকম পছন্দ করে। আমি মেজোকুমারের হয়ে একবার সুপারিশ

করেও কোনো ফল হল না।

'কাজেই আমাকেই রাজি হতে হল। আমার তখন জোয়ান বয়স, সবে ত্রিশ পেরিয়েছে। চোখে মাইনাস পাওয়ারের পুরু চশমা সত্ত্বেও অব্যর্থ টিপ। কর্নেল হোয়াইটহেড নিজে হাতে ধরে বন্দুক চালানো শিখিয়েছেন আজমিরে থাকতে।

'যেখানে উৎপাতটা হচ্ছে, সেখানে পৌঁছতে হলে একটা ছোট নদী পেরোতে হয়। সে নদীর নাম লুঙ্গি কেন জিগ্যেস করিসনি ন্যাপলা, কারণ উত্তর আমি জানি

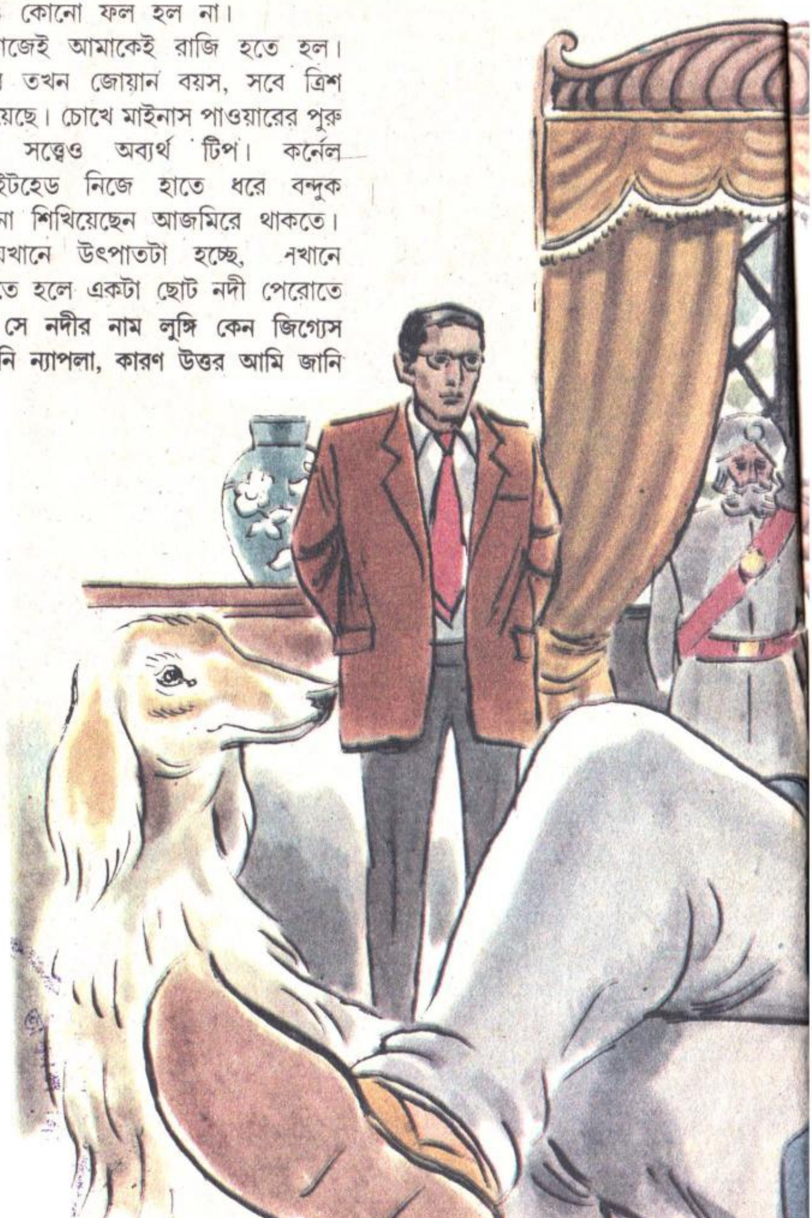

না। এই লুঙ্গিরই পাশে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় মাস চারেক হল এক বাবাজি এসে আস্তানা গেড়েছেন, এ-খবর আমরা পেয়েছি। রাজার আবার হোলি ম্যানে খুব বিশ্বাস ; বলে দিলেন যাবার সময় আমি যেন

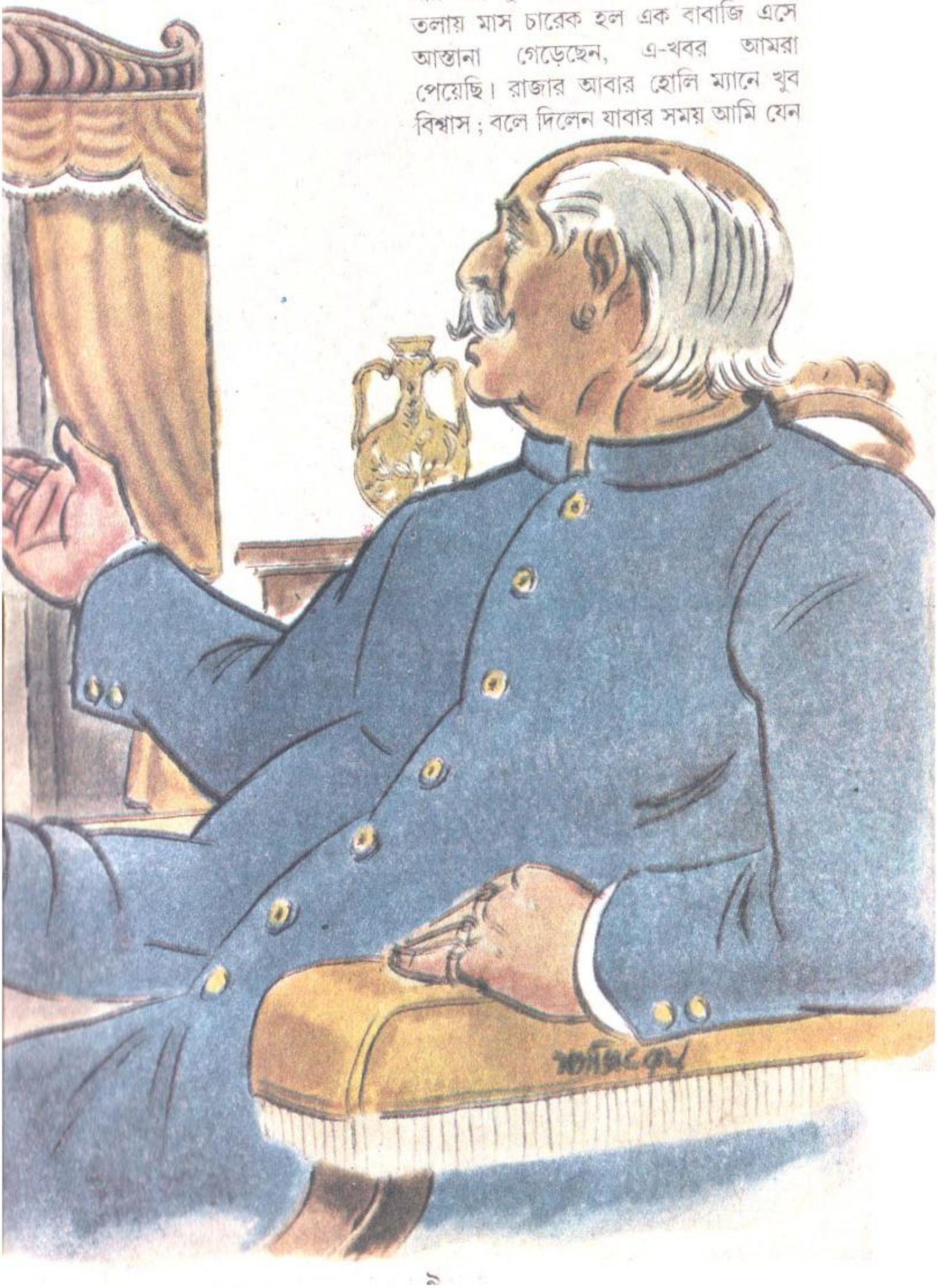

একবার দেখা করে যাই। রাজা শুনেছেন বাবাজির কাছে নাকি অনেকরকম ওষুধ আছে; যদি ডায়াবিটিসের কোনো ওষুধ বলতে পারেন আমি যেন সেটা জেনে নিই।

'জানুয়ারি মাস, প্রচণ্ড শীত পড়েছে সেবার, তারই মধ্যে দুটি বেয়ারা সমেত বেরোবার সব তোড়জোড় করে ফেললাম। রাজার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি মেজোকুমার বসে রয়েছেন তাঁর ঘরে। বুঝলাম একটা কথা-কাটাকাটির মাঝখানে গিয়ে পড়েছি। রাজা তখনও হাঁপাচ্ছেন, এবং আমার সামনেই মেজোকুমারকে কড়া কথা শুনিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বিদায় করে দিলেন। বেরোবার মুখে কুমার আমার প্রতি যে দৃষ্টি হানলেন, সেটা মোটেই প্রসন্ন নয়। বুঝলাম তাঁকে বাদ দিয়ে আমাকে বাঘ মারতে পাঠানো হচ্ছে সেটা আদৌ ওঁর মনঃপূত নয়। তবে সিদ্ধান্তটা তো আমার নয়, সেটার জন্য দায়ী স্বয়ং রাজা ভূদেব সিং। কাজেই আমার উপর চোখ রাঙানোর কারণটা বোধগম্য হল না।

'লুঙ্গি নদী ডুমনিগড় থেকে ৩২ মাইল, অর্থাৎ আজকের হিসেবে পঞ্চাশ কিলোমিটার। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে, তবে ডুমনিগড়ে জীপ আসেনি। রাজার একটা পুরনো ফোর্ড ছিল, সেটা খুব মজবুত। তাতে করেই পৌঁছে গেলাম এক ঘণ্টার ভেতর। শিকারের জন্য যাবতীয় যা কিছু দরকার, সবই সঙ্গে এসেছে। নদী পেরিয়ে আরো যেতে হবে সতেরো মাইল, তার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি থাকবে ওপারে। রেঞ্জার নিজেও থাকবেন; আমরা গিয়ে উঠব ফরেস্ট রেস্ট হাউসে।

'অবিশ্যি ওপারে যাবার আগে একটা কর্তব্য সারতে হল। উদাস বাবার আশ্রমে একবার ঢুঁ দিতে হল। গেরুয়াধারী বাবাজি শিষ্য-শিষ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে পর্ণকুটিরের সামনে বাঘছালের উপর বসেছেন, সামনে ধুনি জ্বলছে। চেহারাটি বেশ ভক্তি-উদ্রেককারী, দাড়ি-গোঁফ-জটা সত্ত্বেও অনেক সাধুর চেয়ে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জংলিভাব একেবারেই নেই।

'সাধু আমাকে দেখেই স্মিতহাস্য করে "আইয়ে" বলে তাঁর সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে বসলাম। সাধু চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ঠোঁটের কোণে সেই স্মিত হাসির রেশ। মনে মনে ভাবছি এত দেখার কী আছে, এমন সময় বাবাজি হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাঙালি?" এবং যেভাবে যে-উচ্চারণে বললেন তাতে বুঝলাম ইনি নিজেও বাঙালি। এতে অবাক হলাম বই কী, কারণ যেদিন থেকে বাবাজি আস্তানা গেড়েছেন সেদিন থেকে শুনছি এনার কথা, কিন্তু কেউ বলেনি ইনি বঙ্গসন্তান।

'"কী চাস তুই?"

'এখানে বলে রাখি, বাবাজিদের এই হোলসেল তুইতোকারির ব্যাপারটা আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। তাই এনার প্রশ্ন শুনে ধাঁ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল। বললাম, "রাজার অনুরোধে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

'বাবা কিন্তু আমার মুখে তুই শুনে মোটেই বিরক্ত বা বিচলিত হলেন না। বরং এবার যে-কথাটা বললেন, তাতে আমি হকচকিয়ে গেলাম তো বটেই, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা নম্রও হয়ে গেলাম।

'"রাজার জন্য ওষুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি। বলিস চিন্তা করার কিছু নেই। অসুখ সেরে যাবে, তবে পুত্রশোক থেকে রেহাই নেই। বড়টা গেছে, পরেরটাও যাবে। ছোটটি ভাল ছেলে, সেই বাপের মুখ রাখবে। তবে রাজত্ব নেই কপালে, কারণ রাজা আর থাকবে না দেশে। দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।"

'আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় বাবাজি বললেন, "তোর জন্যেও ওষুধ আছে।"

'আমার ওষুধ? সে আবার কী? জিগ্যেস করলাম, "কিসের ওষুধ?"

"'তুই বাঘের পেটে যেতে চাস?"

"'সেটা আর কে চায় বলুন।"

"'তাহলে আরো কাছে আয়।"

'আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম সাধুবাবার দিকে। বাবাজি তাঁর ঝোলা থেকে একটা কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা সবুজ মলম নিয়ে আমার কপালে ঘষে দিলেন। হিঙ আর কস্তুরী মেশানো একটা গন্ধ এল নাকে।—"ব্যস্, আর ভয় নেই তোর।"

'রাজার জন্য ওষুধ নিয়ে বিদায় নিলাম। মনে-মনে বললাম, বাবাজির ক্ষমতা অসীম, কারণ আমার কাছ থেকে "তুই" থেকে "আপনি" সম্বোধন আদায় করে নিতে লেগেছে ঠিক দু মিনিট।

'রেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলাম আধ ঘণ্টার মধ্যেই। গিয়ে দেখি সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি আসছি সে-খবর আগেই পৌঁছে গেছে, তিন গাঁয়ের তিন মোড়ল এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললাম আমার যতদূর সাধ্যি আমি করব।

'শীতকালের দিন ছোট, তাই সাড়ে চারটের মধ্যে বনমোরগের রোস্ট খেয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। স্থানীয় শিকারি শুকদেও তেওয়ারি আমাকে সাহায্য করছে; সে মাচা বাঁধার জন্য গাছ বেছে রেখেছে সমতল জমি যেখানে শেষ হয়ে পাহাড় শুরু হয়েছে সেইরকম একটা জায়গায়। কাছাকাছির মধ্যে বাঘের পায়ের টাট্‌কা ছাপ পাওয়া গেছে। একটি মোষও কেনা হয়েছে টোপ হিসেবে, সব মিলিয়ে ব্যবস্থা ভালই। আমি একাই থাকব পাহারায়, সকালে শিকারি ও কুলির দল এসে আমায় মীট করবে। তার মধ্যে যদি কাজ সারা হয়ে যায় তো ভালই, নইলে কাল সন্ধে থেকে আবার বসতে হবে। এ-ভাবে কতদিন চলবে জানা নেই।

'রেস্ট হাউস ছাড়বার মুখে আরেকটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। এ-আওয়াজ আমার চেনা। এ হল মেজোকুমারের পন্টিয়াক টুরার। ব্যাপার কী?

'মেজোকুমার গাড়ি থেকে নেমেই

কারণটা জানিয়ে দিলেন। বললেন বাবাকে বলে রাজি করিয়েছেন, তিনিও আমার সঙ্গে নরখাদকের সন্ধানে যাবেন। এমন একটা গুরু দায়িত্ব শুধু একজনের উপর দেওয়ার কোনো মানে হয় না।—"দাদার মৃত্যুতে বাবার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।"

'কথাটা শুনে আমার মোটেই ভাল লাগল না। রাজা সত্যিই অনুমতি দিয়েছেন কি না জানার কোনো উপায় নেই। আমার ধারণা তিনি বারণই করেছেন, কিন্তু ঈর্ষাবশত ইনি নিজেই চলে এসেছেন।

'কী আর করি। মনিবের সন্তান, তার সঙ্গে তো আর ঝগড়া চলে না। তখনই তেওয়ারিকে বলে একটা দ্বিতীয় মাচার বন্দোবস্ত করা হল। তবু ভাল যে, মেজোকুমার তাঁর নিজের জন্য শিকারের সব সরঞ্জাম সঙ্গেই এনেছিলেন।

'দুজনে গিয়ে উঠলাম মাচাতে। আমারটা শিমুল গাছ, ওনারটা বাদাম। আমাদের রেখে দল ফিরে গেল। আমরা রাত্রি জাগরণের জন্য তৈরি হলাম। নীচে থেকে যাতে বাঘ বুঝতে না পারে তার জন্য দুটো মাচার নীচেই লতাপাতা দিয়ে ক্যামুফ্লাজ করা হয়েছে। ব্যবস্থা পাকাপোক্ত।

'কুমার দেখি মাচায় উঠে ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলেছেন। আমি ইশারায় তাঁকে বারণ করার চেষ্টা করলাম, তিনি আমার দিকে চেয়েও চাইলেন না।

'অন্ধকারটা যেন একটু আগে হল মনে করে আকাশের দিকে চেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখি, কালো মেঘে দিগন্ত ছেয়ে গেছে।

'ছ'টা নাগাত বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বাঘ বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না, শিকারিরও করা উচিত নয়, কিন্তু শীতকালের বৃষ্টি বলেই বোধহয় অনুভব করলাম ওভারকোট ভেদ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল আমায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। এমনিতে আমার অসুখ-বিসুখ হয় না বললেই চলে, কিন্তু সর্দি জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই। এটা চিরকালের ব্যাপার। যখন একটা হাঁচি হল, তখন প্রমাদ গুনলাম। মাচায় বসা শিকারির পক্ষে হাঁচি-কাসি যে কী সর্বনেশে ব্যাপার, তা বোধহয় তোদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। তাছাড়া হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী বলেছিল আমার অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে। একে বাজ পড়ছে, তায় গাছের উপর বসা। পরিস্থিতিটা মোটেই ভাল লাগল না।

'এবার কুমারকে ইশারা করে জানালাম আমি মাচা থেকে নেমে পড়ছি। আজ আর ম্যানইটারের সঙ্গে মোকাবিলা হবে না, কারণে এই হাঁচি শুনে তিনি আর এ-তল্লাটে আসবেন না।

'নীচে মোষটা জলে ছটফট করছে, আর গলায় বাঁধা ঘণ্টা অনবরত টিংটিং করছে। মাচা থেকে নামতে-নামতে মনে হল মেজোকুমারের ভাগ্য ভাল; নরখাদক সংহারের ক্রেডিটটা হয়তো তিনি একাই পাবেন। আমার এখন আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই; এই বৃষ্টিতে আর ভিজলে নিউমোনিয়া অবধারিত।

'জঙ্গলের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানি মাঝে-মাঝে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। আমি টর্চের সাহায্য না নিয়েই এগিয়ে চললাম যেদিকে পাহাড় সেই দিকে। হাতে বন্দুকটা নিয়েছি, কারণ সেটার যে প্রয়োজন হবে না, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

'পাহাড়ের গায়েও গাছপালা ঝোপঝাড়ের অভাব নেই, তারই মধ্যে দিয়ে হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে উঠে গিয়ে হঠাৎ সামনে একটা ঘোর অন্ধকার কী যেন এসে পড়ল। বিদ্যুতের আলোতেও যখন সে-অন্ধকার দূর হল না, তখন বুঝলাম সেটা একটা গুহার মুখ। গিয়ে ঢুকলাম ভিতরে। মাথার উপর বারিবর্ষণ দূর হল। বাঁচা গেল। শেলটার

পেয়ে গেছি। পকেট থেকে টর্চ বার করে সামনে ফেলে বুঝলাম, গুহার অপর দিকের দেয়াল টর্চের আলোর নাগালের বাইরে। কমপক্ষে পাঁচশো লোক এ-গুহায় আশ্রয় নিতে পারে।

'আলোতেই দেখলাম সামনেই একটা মাঝারি আকারের পাথরের চাঁই। সেটাতে পিঠ দিয়ে বসলাম গুহার মেঝেতে। বাইরে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিদ্যুতের আলোতে বুঝতে পারছি পাহাড়ের গা দিয়ে জলের ধারা নেমে এসে গুহার মুখের সামনে একটা ছোটখাটো জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। পকেটে সিগারেট দেশলাই ছিল। সেটা এই অবস্থায় ব্যবহারযোগ্য হবে কি না ভাবছি, এমন সময় তড়িৎ-ঝলকানিতে একটা ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম।

'একটি লোক এসে গুহার ভিতর ঢুকল।

'লোকটির সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটা থেকে বুঝতে পারলাম ইনি মেজোকুমার। তাঁর সাত বছর বয়সে পায়ের পাতার উপর দিয়ে চলে যায় বাপের রোলস রয়েস গাড়ি। সাহেব ডাক্তার মেজর স্টেবিংস-এর অস্ত্রোপচারের ফলে পা সেরে যায় ঠিকই, কিন্তু ডান পায়ের তুলনায় আধ ইঞ্চি ছোট হয়ে যায়। তার ফলেই এই খোঁড়ানো।

'মেজোকুমারের অন্ধকার দেহ আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার পাশেই বসল। একটা বোটকা গন্ধ কিছুক্ষণ থেকে পাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে এবার হেনেসি ব্র্যাণ্ডির গন্ধ যোগ হল। তারপর অনুভব করলাম গরম নিশ্বাস পড়ছে আমার মুখের উপর। তারপর মেজোকুমারের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করল আমার কানে।

"'শত্রুর শেষ রাখতে নেই জানো?"

'বলে কি লোকটা? আমি ওর শত্রু হতে যাব কেন?

"'তোমাকে যখন আমি দেখে চিনেছি সেই রাতে, তখন তোমারও আমাকে দেখা এবং চিনে ফেলাটা আশ্চর্য নয়।"

"'কোন্ রাতে?"

"'সেটা কি বলে দিতে হবে? ইমলি-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। দাদা ফিরছিল শ্রীমলের বাড়ি থেকে।"

'আমার গরম লাগতে শুরু করেছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হয়। এই মেজোকুমারই তাহলে হত্যাকারী,

নারায়ণ শ্রীমল নয়। দাদাকে হটিয়ে নিজে গদিতে বসার লোভ। যেমন আরো অনেক রাজপরিবারেই হয়ে থাকে। কিন্তু আমায় সে চিনল কী করে সে-রাতে?

'উত্তর এল মেজোকুমারের মুখ থেকেই।

"'ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছিল তখন। তোমার চশমার কাঁচ চক্‌চক্‌ করছিল সেই আলোয়। এত পুরু কাঁচ ও তল্লাটে আর কারুর নেই।"

'আমি চুপ করে আছি। আমার চোখের পাওয়ার মাইনাস নয়। এই চশমাই আমাকে বিট্রে করল।

'একটা খুট্‌ করে শব্দ পেলাম। মেজোকুমারের টোটা-ভরা রাইফেল উঁচিয়ে উঠেছে। ওর ও আমার মধ্যে ব্যবধান দুহাতের। ওই বাঘ-মারা বারো বোরের আগ্নেয়াস্ত্র এই দূরত্ব থেকে আমার উপর প্রয়োগ করলে আমার দেহ শতটুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে গুহার চারিদিকে।

'কিন্তু ওটা কী?

'এক জোড়া জ্বলন্ত মার্বেল এগিয়ে আসছে আমার দিকে মেজোকুমারের পিছন থেকে। আর তার সঙ্গে সেই বোটকা গন্ধ।

"'সে ইয়োর প্রেয়ারস, মিস্টার চ্যাটার্জি!"

'বিদ্যুতের আলোতে বন্দুকের ইস্পাতের নল ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'আর পরমুহূর্তেই একটা ভারী ধাতব শব্দে বুঝতে পারলাম বন্দুক গুহার মেঝেতে আছড়ে পড়েছে।

'একটা গোঙানির শব্দ ক্রমে দূরে সরে গেল। আর সেই সঙ্গে জ্বলন্ত মার্বেল দুটোও।

'আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

'ক্রমে বজ্রবিদ্যুতের তেজ কমে এল, বৃষ্টির শব্দ থেমে এল।

'বোধহয় নার্ভাস স্ট্রেনের দরুন, কিম্বা হয়ত জ্বর ছিল শরীরে, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। গুহাটা যে কত বড় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। আমি যেদিকে বসা তার বিপরীত দিকে দেয়ালের সামনে পড়ে আছে মেজোকুমারের আধখাওয়া মৃতদেহ। কিন্তু নরখাদকের কোনো চিহ্ন নেই।

'গুহার বাইরে একটা পাথর-খণ্ডের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম হাতে বন্দুক নিয়ে। একটা খুঁতখুঁত ভাব ছিল মনে। কারণ এটা জানি যে, বাঘ সুযোগ পেয়েও আমাকে খায়নি—সেটা বাবাজির মলমের জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক। শুধু তাই নয়, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা করেছে। তবে গ্রামের লোকেরা যে লাঞ্ছিত, সে-কথা তো মিথ্যে নয়; তাই মন থেকে মমতা দূর করে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম।

'আটটা পর্যন্ত বসে থেকেও যখন বাঘের দেখা পেলাম না, তখন অগত্যা ফিরতি পথ ধরলাম। মাচার কী অবস্থা দেখতে হবে গিয়ে। সেখানে চায়ের ফ্লাস্ক, জলের বোতল, বালিশ কম্বল ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে।

'জায়গাটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কিন্তু যা দেখলাম তাতে চক্ষু ছানাবড়া।

'মাচা সমেত শিমুল গাছ বজ্রপাতে ঝলসে গেছে, আর তার পাশেই পড়ে আছে মৃত মোষ, আর তার কাঁধে দাঁত-বসানো মৃত নরখাদক। সে এক বিচিত্র ছবি। মানুষের হাতের বন্দুকের চেয়ে হাজার গুণে বেশি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের শিকার হয়েছে এরা, সেটা আর বলে দিতে হয় না।

'ফেরার পথে বাবাজিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর পর্ণকুটির ভাসিয়ে নিয়ে গেছে লুঙ্গি নদী গতরাত্রের বৃষ্টিতে। তিনি নিজে নাকি একটি সেগুন গাছে চড়ে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু আপাতত সর্দিজ্বরে কাবু হয়ে এক শিষ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।'

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে: গবা কি পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" কোথায় আছে, জানবার জন্য পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর খুন হয়। যুধিষ্ঠির তারই ছেলে। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে খেল্বা দেখাত। পুলিশের নজরে পড়ায় সে গা ঢাকা দেয়, কিন্তু তার গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলের সাহায্যে কাকাতুয়া ও রামুকে ইতিমধ্যে লুঠ করেছে ডাকাত সাতনা। অনুতপ্ত নয়নকাজল ও রামু পালাতে গিয়ে শংকর মাঝির শাকরেদ কিংকরের হাতে ধরা পড়ে। কিংকর তাদের সাতনার হাতে তুলে দেয়। কিন্তু কিংকরই আবার প্রাণে বাঁচায় রামুকে। কিংকর যে কে, সাতনা সেটা আঁচ করেছে। তারপর···

॥ ৩০ ॥

কোনো কথা না বলে দুখানা তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ কিঙ্করকে দেখল সাতনা। তারপর বলল, "তোমার বড্ড ঝাঁজ হে। ঝাঁজালো লোক আমি পছন্দ করি বটে, তবে বেশি ঝাঁজ ভাল নয়।"

কিঙ্কর কথা বলল না। কটমট করে তাকিয়ে রইল। সাতনা একটা হাঁক দিলে এক স্যাঙাত দৌড়ে আসে। সাতনা তাকে বলে, "যা, রামুকে ধরে নিয়ে আয়।"

কিঙ্করের পিছনে দশখানা বল্লম উঁচিয়ে আছে। সে অবশ্য গ্রাহ্য করল না। একমনে খেজুর-রস খায় আর মাঝে-মাঝে সাতনার দিকে আগুনপারা চোখ করে চায়।

একটু বাদেই নড়া ধরে রামুকে নিয়ে এল সাতনার স্যাঙাত। অল্প সময়ের মধ্যেই রামুর মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখে আতঙ্ক। তাকে দেখে কিঙ্কর সাতনার ওপর রাগে দাঁতে দাঁত পিষল।

সাতনা কিঙ্করকেই লক্ষ করছিল। একটু হেসে বলল, "রাগ কোরো না হে। মায়াদয়া করলে আমাদের চলে না। ওহে রামু, এই লোকটাকে চেনো?"

রামু দিশাহারার মতো চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর কিঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, "চিনি। এই লোকটাই কাল রাতে আমাদের ধরে এনেছে।"

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, "সে তো জানি। সে-কথা নয়। লোকটাকে আগে থেকে চেনো কিনা ভাল করে দেখে বলো তো।"

রামু ভাল করেই দেখল। আবছা-আবছা একটা চেনা মানুষের আদল আসে বটে, কিন্তু সঠিক চিনতে পারল না। মাথা নেড়ে সে বলল, "চিনি না।"

"খুব ভাল করে দেখলে চিনতে পারতে কিন্তু। অবিশ্যি তোমার দোষ নেই। এই লোকটা হরবোলা। একসময়ে সার্কাসে হরেক রকম পাখি আর জানোয়ারের ডাক নকল করত। যে-কোনো মানুষের গলা একবার শুনে হুবহু সেই গলায় কথা কইতে পারে। সুতরাং গলা শুনে একে চিনবে না। আর চেহারা? যে-চেহারাটা এখন দেখছ সেইটেও এর আসল চেহারা নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি। দরকার শুধু থিয়েটারের সঙ সাজার কয়েকটা জিনিস। তাহলেই...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ..."

সাতনা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ল।

কিঙ্কর স্থির চোখেই সাতনার দিকে চেয়ে ছিল। কথা বলল না।

সাতনা হাসি থামিয়ে কিঙ্করের দিকে চেয়ে বলল, "তোমার অনেক গুণ। এত গুণ খামোখা নষ্ট করলে হে।"

কিঙ্কর একটু হেসে বলে, "তোমারও অনেক গুণ। সেইসব গুণ তুমিও অকাজে নষ্ট করলে সাতনা। তবে বলি, তোমার ক্ষতি করতে

আমার আসা নয়। আমি তোমাকে দুটি কথা বলব। বেশ মন দিয়ে শোনো।"

সাতনা হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখ করে কিঙ্করের দিকে চাইল। তারপর বলল, "শুধু গুল মেরে এই জাল কেটে বেরোতে পারবে না। কাজেই বলার আগে ভেবেচিন্তে নাও, যা বলবে তা সত্যি কিনা।"

"আমি যা বলব তা সত্যি। তবে এত লোকের সামনে বলা যাবে না। কথাটা বড়ই গোপন।"

সাতনা পাহাড়প্রমাণ শরীরটা টান করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "ঠিক আছে। চোরকুঠুরিতে চলো। তবে তোমার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকবে।"

"ঠিক আছে। তাই-ই সই।"

"সার্কাসে তুমি হাতকড়া খোলার খেলা দেখাতে। আমার সব মনে আছে। কিন্তু এখন চালাকি করে হাতের দড়ি খুলতে যেও না। আমার কাছে রিভলভার আছে। মনে রেখো।"

দুটো লোক এসে কিঙ্করের হাত পিছমোড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর সাতনা আর কিঙ্কর গিয়ে ঢুকল চোরকুঠুরিতে।

কিঙ্করকে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে মুখোমুখি বসল সাতনা। হাতে সত্যিই ছ'ঘরা রিভলভার। বসে বলল, "যা বলার চটপট বলে ফ্যালো।"

"আমি কাকাতুয়াটাকে দিয়ে কথা বলাতে পারি।"

"পারো? বটে?" সাতনা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

কিঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "পারি। অনেক ভেবেচিন্তে কায়দাটা বের করেছি। কিন্তু পাখিটা কথা বললে তোমরা সেই গুপ্তধন বের করবে। অথচ ওই গুপ্তধন তোমাদের পাওনা নয়। আইন বলে, যত গুপ্তধন পাওয়া যাবে তার সবই গবর্মেণ্টের। কিন্তু তোমরা গবর্মেণ্টকে এক পয়সাও দেবে না।"

সাতনা জলদগম্ভীর স্বরে বলে, "শুধু এই কথা?"

"না। আরো আছে। গোবিন্দ ওস্তাদকে তুমি চেনো। বেচারা মিথ্যে খুনের মামলায় ফেঁসে গেছে। অথচ তা উচিত নয়। আসল খুনীর উচিত, নিজের দোষ স্বীকার করে নির্দোষ লোকটাকে খালাস করে দেওয়া।"

সাতনার মুখ ফেটে পড়ছিল দুর্দান্ত রাগে। খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, "আর কিছু?"

"হ্যাঁ। আর একটা কথা। তোমার যে-মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল, আমি তার সন্ধান জানি। সে যে তোমারই মেয়ে তার প্রমাণও দিতে পারি।"

আস্তে-আস্তে, খুব আস্তে-আস্তে সাতনার মুখে একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। কর্কশ, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর মুখখানা যেন কোমল হতে লাগল। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। একটা দমকা শ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট গলায় সে বলল, "মিথ্যে কথা!" একটু থেমে আবার বলল, "মিথ্যে কথা! তুই আমাকে ভোলাতে এসেছিস!"

বলতে বলতে সাতনা উঠে দাঁড়াল।

"না সাতনা, তোমাকে ভোলানোর ক্ষমতা আমার নেই। এই দ্যাখো—" বলে পিছন থেকে ডান হাত বের করে কিঙ্কর তার বালাপোশের কোটের ভিতর দিকে হাত ভরে একখানা ফোটো বের করে আনল।

সাতনা হাঁ করে চেয়ে দৃশ্যটা দেখে বলল, "হাত খুলে ফেলেছ! তোমাকে বলেছিলাম না চালাকি করার চেষ্টা করলে—"

কিঙ্কর অমায়িক একটু হেসে বলে, "আমার হাত কিছুতেই বাঁধনে থাকতে পারে না, বুঝলে!

আপনা থেকে খুলে বেরিয়ে আসে। থাকগে, আবার নাহয় বাঁধতে বলে দাও।"

সাতনা জানে, সে-চেষ্টা বৃথা। হাত বাড়িয়ে সে ফোটোটা নেয়। অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থাকে ফোটোটার দিকে। চোরকুঠুরিতে শুধু একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলোতেও ফোটোর মেয়েটির মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় সাতনা। তার মেয়ে চুরি যায় পাঁচ-ছ বছর বয়সে। এই মেয়েটির বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। কিন্তু কী হুবহু মিল। তার মেয়েটা বেঁচে থাকলেও এই বয়সীই হওয়ার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা কতদিন আগেকার ফোটো?"

"গত বছরের। তোমার মেয়ের বয়স এখন চোদ্দ বা পনেরো।"

"আর কোনো প্রমাণ আছে?"

"আছে। তবে তা দিয়ে আর তোমার দরকার কী? আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। এ তোমারই মেয়ে এবং সে বহাল তবিয়তে বেঁচেও আছে।"

সাতনা ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। বারবার ঢোঁক গিলছে। চোখে জল আসছে। অত বড় সা-জোয়ান লোকটার হাত দুটো কাঁপছে থরথর করে। সে জিজ্ঞেস করল, "আমার মেয়ে কোথায়?"

"সেইটে এখন বলতে পারছি না।"

"বলো!" বলে সাতনা প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কিঙ্করকে। একটা রামঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "শিগগির বলো! নইলে মেরে ফেলব।"

কিঙ্কর নিজের শরীরটাকে একটু মোচড় দিয়ে ঘুরে গেল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে হাতটা তুলে সাতনার ঘাড়ে হাতের চেটোর ধার দিয়ে একটা কোপ মারল।

"আঁক" করে একটা শব্দ হল শুধু। তারপর হাতির মতো বিশাল শরীর নিয়ে সাতনা ঢলে পড়ল মেঝের ওপর।

কিঙ্কর ঘরের কোণে একটা জলের কুঁজো অনেকক্ষণ আগেই লক্ষ করেছে। এখন সেইটে তুলে এনে সাতনার চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগল।

একটু বাদেই চোখ মেলে উঠে বসল সাতনা।

কিন্তু এ এক অন্য সাতনা। (ক্রমশ)

হিমশিম

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

হিম ঝিমঝিম আবছা চাঁদ
আঁকড় ডালে মাকড় ফাঁদ।
মাকড়-ফাঁদে মাছি, মশা
আটকা পড়ে মরণ-দশা।
শুকনো ডাঙা, হিমের মাস
রবিফসল খেতের চাষ।
চাষের খেতে মটর ছোলা,
শিমের লতা মাচায় তোলা।
মাচার তলায় হাঁসা-হাঁসি।
হিম-রোদেতে ঝিমোয় আসি।
গুগলি, ঝিনুক, শেওলা, পানা,
খাল-বিলে নেই হাঁসের খানা।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অনন্যর অন্য পরীক্ষা

শ্রীধর সেনাপতি

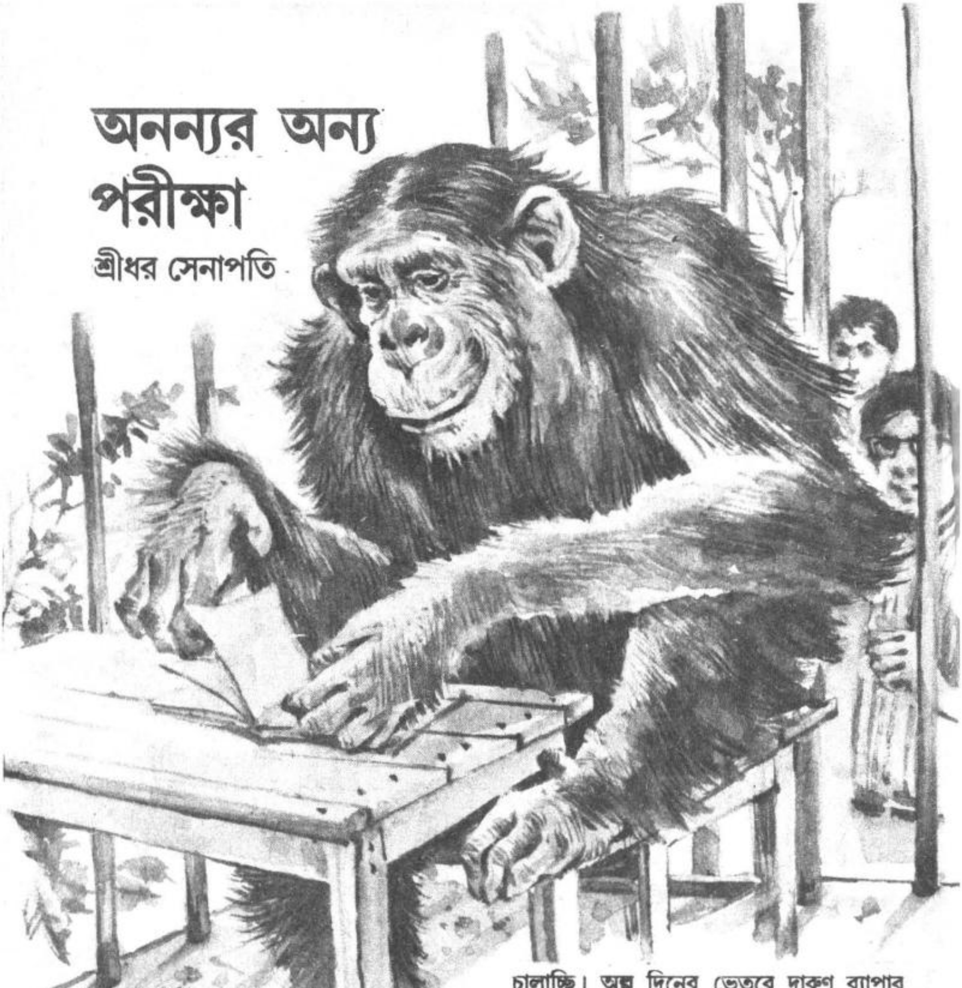

আমার বন্ধু সুমন্ত্র একজন বিজ্ঞানী। নানা জাতের পশুপাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞান-জগৎকে ও অনেক নতুন তথ্য দিয়েছে। বিজ্ঞানী হিসেবে নামটাম হয়েছে একটু। নিজের ল্যাবরেটরির জন্যে অকাতরে টাকাপয়সা খরচ করে থাকে ও।

সুমন্ত্র আমাকে টেলিফোনে জানাল, "চুংকু, আফ্রিকা থেকে একটা বড় শিম্পাঞ্জি আনা হয়েছে। সেটাকে নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। অল্প দিনের ভেতরে দারুণ ব্যাপার ঘটিয়ে দিয়েছি। যদি দেখবার কৌতূহল জাগে এসে দেখে যাও।" কৌতূহল ছিল। একদিন গেলাম দেখতে। আমার ভাগ্নে শ্রীমান্ অনন্যকেও সঙ্গে নিলাম। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সুমন্ত্রর ল্যাবরেটরিতে ধরে-রাখা নানা জাতের পশুপাখি দেখে ও চিড়িয়াখানায় বেড়ানোর আনন্দ পেতে পারে। আগে সুমন্ত্রর মিনি চিড়িয়াখানার গল্প আমার কাছ থেকে শুনেছিল শ্রীমান্।

শহরের বাইরে একটা পুরনো আম-কাঁঠালের বাগানের ভেতর বেশ বড় জায়গা জুড়ে সুমন্ত্রর ল্যাবরেটরি। পাশে একটা বড় ঘরে পশুপাখিদের ছোটবড় অনেক খাঁচা সাজানো। অনন্যর উৎসাহের শেষ নেই। আমার সঙ্গে ও

সুমন্ত্রর ল্যাবরেটরির পশুপাখিদের দেখতে লাগল ঘুরে ঘুরে।

সুমন্ত্র শিম্পাঞ্জির খাঁচার কাছে আমাদের নিয়ে গেল। বেশ বড়সড় চেহারার প্রাণী। শরীর ঢাকা ঘন চিকন কালো লোমে। নাম রাখা হয়েছে ব্ল্যাকি। খাঁচার ভেতরে একটা চেয়ার এবং একটা টেবিল রয়েছে।

সুমন্ত্র 'ব্ল্যাকি' বলে ডাকতেই শিম্পাঞ্জিটা পা-পা করে খাঁচার ধারে এগিয়ে এল। সুমন্ত্রর হাতে ছিল একটা মোটা আকারের বিজ্ঞানের বই। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে সে বইখানা ব্ল্যাকির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "বইটা নিয়ে যাও। ওই চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা উলটে যাও পর-পর।"

শুনেই সুবোধ বালকের মতো ভারী বইখানা বগলে চেপে ধরে গুটিগুটি পায়ে চেয়ারের কাছে চলে গেল ব্ল্যাকি। বসল মানুষের মতো পা ঝুলিয়ে। তারপর বইখানা সামনে টেবিলের ওপরে রেখে পর-পর বইয়ের পাতা উলটে যেতে লাগল মনোযোগী ছাত্রের মতো।

দৃশ্য দেখে আনন্দে নেচে উঠল অনন্য। হাতে তালি বাজিয়ে বলল, "বাঃ বাঃ! কী সুন্দর।"

সুমন্ত্র আশাভরা উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক খরচ, অনেক পরিশ্রম করে তবে এই ফল পেয়েছি, চুংকু। শিম্পাঞ্জির মুখ দিয়ে মানুষের ভাষা বের করা সম্ভব কি না, আমার এক্সপেরিমেন্টের বিষয় এখন এটাই। হরমোন দিয়ে নতুন পথে পরীক্ষা চালাচ্ছি।"

সুমন্ত্রর ওখান থেকে চলে আসার সময়ে সারা পথ লক্ষ করলাম, শ্রীমান্ অনন্যর মুখখানা বেশ গম্ভীর। মুখে কোনো কথা নেই। হয়তো ওখানে আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল। তাড়াতাড়ি চলে আসাটা পছন্দ হয়নি।

যাই হোক, বাড়ি পৌঁছে বোঝা গেল অনন্য ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে মোটামুটি খুশিই হয়েছে। মায়ের কাছে ও সুমন্ত্রর ল্যাবরেটরির গল্প করতে লাগল বেশ উৎসাহের সঙ্গে।

আট-দশ দিন বাদে দিদি আমাকে বলল, "চুংকু, অনুকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। ওকে বাঁদরে আঁচড়ে দিয়েছে।"

বাঁদর! একটু চমকে উঠলাম। "সে কী! বাঁদর এল কোথা থেকে! বাঁদরের উৎপাত

কনের সাজ

জীবিতেশ চক্রবর্তী

শীত পড়েছে কনকনে,
বিয়ের রাতে কন কনে,
'কেই বা দেখে শাল তুলে আর
বাউটি-চুড়ি-কঙ্কণে!'
'বৃথাই সাজা এই শীতে,'
বললে পাড়াপড়শিতে;
দাদু বললেন, 'কনের হাতে
দাও পরিয়ে দস্তানা —
হাত বাড়িয়ে মাল্যবদল
শীতের রাতে — শস্তা না!'

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের পাড়ায় 'তো ছিল না কোনোদিন।"

দিদি বলল, "বাজারের কাছে বকু নামে কে-এক রিকশাওলার নাকি একটা বাঁদর আছে।"

"হ্যাঁ, আছে। জানি। তা অনুকে সেটা কী করে আঁচড়ে দিল?"

দিদি বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, "ওই বাঁদরের সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়েছিল আর-কী! বাঁদর ওইভাবে আদর করেছে।"

এমন সময়ে শ্রীমান্ অনন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেশ হাসিখুশি মুখ। আমার চোখের সামনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, মামা। বাঁদরটা সামান্য একটু আঁচড়ে দিয়েছিল। হাতের চামড়ায় শুধু একটু কালো দাগ, আর কিছু না। মা কী সাংঘাতিক ভিতু! বলে কিনা জন্তু-জানোয়ারে মানুষকে আঁচড়ে বা কামড়ে দিলে নাকি যত খারাপ-খারাপ রোগ হতে পারে।"

দাগটা দেখে মনে হল, সত্যি, ভয় পাবার মতো ব্যাপারই এটা নয়। দিদিকে বুঝিয়ে বললাম। তবু দিদি একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। তাতে আমিও একটু বিরক্ত হয়ে অনন্যকে বললাম, "তা তোকেই বা বকুর বাঁদর আঁচড়ে দিল কেন? তুই কি বকুর রিকশাতে চেপে ভাড়া দিতে চাসনি নাকি?"

অনন্য হাসিমুখে বলল, "না মামা। বকুদা খুব ভাল লোক। পাড়ার সব ছেলেকে সে তার রিকশাতে চাপায়। ভাড়া নেয় না। আসলে আমার ব্যাপারটা হয়েছে একটু অন্যরকম। এখন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি তো। ফিরে এসে তোমাকে বলব সে-কথা।"

কাজে ব্যস্ত থাকায় অনন্যর ওই বাঁদরে আঁচড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা দু'দিনের মধ্যে আর আমার জানা হল না। রবিবার দিন খুব সকালে একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বেলা দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আমি আমার ঘরে ঢুকেই দারুণভাবে চমকে উঠলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখি, আমার টেবিলের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে একটা বাঁদর। সেটার কোলের ওপরে আমার নতুন কেনা ইংরেজি-বাংলা অভিধানখানার পাতা খোলা। টেবিলের কাছে শ্রীমান্ অনন্য দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখেই অনন্য খুশি-খুশি গলায় বলে উঠল, "মামা গো! তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।"

বাঁদরের হাতে আমার নতুন বইখানার পরিণতির কথা ভেবে আমি মনে মনে তখন শিউরে উঠেছি। এ কী বাঁদরামো হচ্ছে এখানে? রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। বইখানা এবার গেল। ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে যাবে। আমি সেদিকে দৌড়ে যাচ্ছিলাম। হাতের ইশারায় অনন্য আমাকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু আমি এ কী দেখছি! বাঁদরটা বইয়ের প্রতিটি পাতা অতি যত্নের সঙ্গে পরপর উলটে যেতে লাগল অনুরাগী পাঠকের মতো। সব-কটি পাতা উলটে দেখে শেষ করে তবে বাঁদরটি অভিধানটিকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। তখন অনন্য নিজের জামার পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে বাঁদরটিকে খেতে দিল। বিস্কুট মুখে তুলতে গিয়ে বাঁদরটি ঘাড় বাঁকিয়ে কুতকুত করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দৌড়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে উধাও হয়ে গেল।

অনন্য আমার একখানা হাত ধরে খুশিতে যেন ফেটে পড়ে বলল, "মামা গো, তোমার বিজ্ঞানী বন্ধু কত টাকা খরচ করে তাঁর ল্যাবরেটরি তৈরি করেছেন। আফ্রিকা থেকে শিম্পাঞ্জি এনে সেটাকে বই পড়াতে শেখাচ্ছেন দেখে এলাম। কিন্তু তুমি দেখলে তো নিজের চোখে। আমি সামান্য চেষ্টাতেই বকুদার বাঁদরকে ওই শিম্পাঞ্জির মতন বইয়ের পাতা ওলটাতে শিখিয়ে দিয়েছি। তাতে খরচ আর কত? ছোলাভাজা, বাদামভাজা আর বিস্কুট। হাতের কাছে যখন যা পেয়েছি, তা-ই বইয়ের ভেতরে এখানে-ওখানে লুকিয়ে রেখে বকুদার বাঁদরকে ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। বইয়ের পাতা উলটে উলটে ওটা বাদাম ছোলা বা বিস্কুট খুঁজছিল।"

শুনে আমি থ! অনন্যর সেই 'অন্যরকম' ব্যাপারটার কথাও মনে এল এখন। কৌতূহল নিরসন করতে জিজ্ঞেস করলাম কী সেই ব্যাপারটা।

শ্রীমান্ অনন্য একমুখ হেসে জবাব দিল, "গোড়ার দিকে এই ট্রেনিং দেবার সময়ে বাঁদরটা আঁচড়ে দিয়েছিল একবার।"

বলে, হাতের ওপরে আঁচড়ানো দাগটা ও খুঁজে দেখল। সেটা অবশ্য প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অ্যালার্ম-ঘড়ি

তারাপদ রায়

আমার দাদার আর আমার পৈতে একসঙ্গে হয়েছিল। সেই সময় অনেক জিনিসের মধ্যে একটা টেবিল-ঘড়ি, যাকে অ্যালার্ম টাইমপিস বলে, আমরা উপহার পাই।

সেই বয়েসেই আমাদের মাথায় সমস্যা ঢুকেছিল, এই ঘড়িকে অ্যালার্ম-ঘড়ি বলে কেন? এর মধ্যে বিপদের কী আছে? সুখের কথা, এই প্রশ্নের উত্তরও আমরা যথাকালে পেয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি বলতে কী, ঐ টেবিল-ঘড়িটির থেকে বিপজ্জনক জিনিস আমার এই সামান্য জীবনে আমি কমই দেখেছি। দু-তিন মাস ঘড়িটা ভালই চলেছিল, তারপর একদিন আমাদের পোষা হুলো বেড়াল জলধির দৃষ্টি ঘড়িটার উপরে পড়ল। জলধির তখন বয়েস হয়েছে, চোখে কম দেখে। ঘড়ির টিকটিক শব্দে আকৃষ্ট হয়ে টেবিলের উপর উঠে প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঘড়িটাকে ঘুরে শুঁকে-শুঁকে দেখল, ঘড়িটায় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল তখন, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বেজে উঠতেই জলধি চমকে এক থাবার আঘাতে ঘড়িটিকে টেবিল থেকে নীচে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। পড়ে গিয়ে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল, কাঁচ ভেঙে গেল।

দিন-পনেরো পরে ঘড়িটা সারিয়ে আনা হল। কিন্তু তখন থেকেই গোলমাল। অ্যালার্ম দিলেই অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়িটা টেবিলের উপর নাচতে থাকত। আর, সে কী নাচ! টেবিলের দু-তিন ইঞ্চি উপরে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে শেষে নীচে গড়িয়ে পড়া। আবার ঘড়ি বন্ধ, আবার কাঁচ ভাঙা।

এই রকম বারকয়েক হল। আমরা সাবধান হলাম। ঘড়ির দুটো পা দাদা শক্ত সুতো দিয়ে দুটো মোটা বইয়ের সঙ্গে বেঁধে দিল যাতে ঘড়িটা অ্যালার্ম বাজার সময় নড়াচড়া না করতে পারে। দাদাকে বলেছিলাম, "অ্যালার্ম না দিলেই হয়।" দাদা জবাবে বলল, "অ্যালার্ম-ঘড়ি অ্যালার্ম না দিলে ঘড়ি কিসের?" কিন্তু এতেও হল না, দুদিন পরেই বই দুটোসুদ্ধ ঘড়িটা টেবিল থেকে পড়ল।

এবার সারিয়ে আনার পরে, টেবিলের উপরে একটা পুরনো তোশক ভাঁজ করে তার উপরে ঘড়িটাকে বসিয়ে দেয়া হল, এতে ঘড়ির নাচ কিছুটা কমল, কিন্তু অ্যালার্ম-বাজনা একদম মার খেয়ে গেল, কেমন চিঁচিঁ করতে লাগল।

অবশেষে ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘড়িটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঐ ভাবেই দম দেওয়া হত, ঐ ভাবেই চলত, অ্যালার্মের সময় ঐ ঝুলন্ত অবস্থায় একটু ছটফট করত, এই যা। চলতে ফিরতে যাতে ঘড়িটা গায়ে না লাগে তাই সাত ফুট উঁচুতে ঘড়িটা দাদা ঝুলিয়ে দিয়েছিল, টেবিলে দাঁড়িয়ে দম দিতে' হত।

একদিন মাস্টারমশাই আমাদের দুজনকে পড়াচ্ছিলেন, মাথার উপরে ঘড়িটা বেশ টিকটিক করছিল। কিন্তু ইঁদুরে বোধহয় ছাদের দড়ির গিঁটটা কেটে দিয়েছিল, হঠাৎ ছিঁড়ে ঘড়িটা মাস্টারমশাইয়ের মাথায় পড়ল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর যা হবার তাই হল। মাস্টারমশাই গেলেন, আমাদের পড়াশুনা গেল, ঘড়িটা তো গেলই।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান
একমাত্র কমপ্লান-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩টি খাদ্যগুণ
বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের কয়েকটি বিশেষ ধরণের প্রয়োজন থাকে। কমপ্লান তাদের দেয় সবচেয়ে সেরা প্রোটিন আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ন্ত বয়েসের চাহিদা মেটাতে আরও অন্যান্য ২২ টি খাদ্যগুণ। মনে রাখবেন, কমপ্লান হ'ল সুপরিকল্পিত আহার যা ডাক্তাররাই বেশী ক'রে সুপারিশ ক'রে থাকেন।
কমপ্লান পাওয়া যায়—চকোলেট, এলাচ-জাফরান ও স্ট্রবেরীর মুখরোচক স্বাদগন্ধে—আর প্লেনও।
Glaxo
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
বিনামূল্যে ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা
"সারা পরিবারের সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে পরামর্শ"-এর জন্যে অনুগ্রহ করে ৫০ পয়সার ডাক টিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন:
পোস্ট ব্যাগ নং ১৯১১৯ (কম্প্) G-260
বম্বে-৪০০ ০২৫।
কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।
LINTAS GLC/6-1810-BG

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৪৩ ॥

রাঙাকাকাবাবুর আনুষ্ঠানিক আহারের পর বাড়ির বড়রা একে একে যে যার ঘরে চলে গেলেন। মা-জননীও নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। মা-জননী ও রাঙাকাকাবাবুর ঘরের মধ্যের দরজায় সেই যে খিল দেওয়া হল, ২৬শে জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত আর খোলা হয়নি। পাশের যে ঘরে ইলা থাকত আমি সেখানে সরে গেলাম এবং জ্যাঠাবাবুর বড় ছেলে আমাদের মেজদার সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। রাঙাকাকাবাবুর রেডিওটা ঐ ঘরে রাখা হয়েছিল। খবর-টবর শুনতে শুনতে মেজদার সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা চলতে লাগল। মেজদা—ধীরেন্দ্রনাথ—গণেশ বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। খুব প্রাণখোলা হাসিখুশি লোক ছিলেন তিনি। তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমরা সকলেই তাঁকে নানাভাবে খ্যাপাতাম।

বড়রা প্রস্থান করবার পরেই রাঙাকাকাবাবুর ঘর সাজানো শুরু হল। দেখলাম অরবিন্দকেও রাঙাকাকাবাবু দলে টেনে নিয়েছেন। বিছানার বড় বড় চাদর টাঙিয়ে ঘরটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। উত্তর দিকে ঘরের অর্ধেকটা আলাদা রইল। দক্ষিণের বেশির ভাগটাই দাদাভাইয়ের প্রকাণ্ড খাটটা ঘিরে রইল। আর-একটা ছোট এলাকা করা হল বাইরে যাবার দরজাটার কাছে। সকলকে বলা হয়েছিল, ঐ এলাকা পেরিয়ে কেউ যেতে পারবে না। মা-জননীর ঠাকুর সর্বেশ্বরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সে ঐ এলাকা থেকে পরদা একটু সরিয়ে খাবারের থালা একটি নিচু ছোট টেবিলে সময়মতো রেখে দিয়ে যাবে। আবার সময়মতো খালি থালা সরিয়ে নিয়ে যাবে।

ইলা ও অরবিন্দ তারপর রাঙাকাকাবাবুর বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ও গেঞ্জি থেকে সেলাই করা '৬' নম্বর চিহ্নগুলি কেটে ফেলে দিল। সেগুলি হোল্‌ড-অলে ঢুকিয়ে সেটি বেঁধে রাখা হল।

সর্বেশ্বর ঠাকুর নিজের অজান্তে অন্তর্ধানের পরিকল্পনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দশদিন পরে কিছুই না জেনে সে ২৬শে জানুয়ারি 'আবিষ্কার' করল যে, খাবার আগের দিন রাত্রে খাওয়া হয়নি, যেমন দেওয়া হয়েছিল তেমনই পড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই সে শোরগোল তুলল, নিশ্চয়ই রাঙাকাকাবাবুর কিছু হয়েছে! যাই হোক, সে পরের কথা। সর্বেশ্বর রাঁধতও ভাল, লোকও ছিল চমৎকার। সে ছিল এক সুদর্শন পুরুষ, শরীরের গঠন ছিমছাম। সে হাত-পা দুলিয়ে নাচিয়ের ভঙ্গিতে চলাফেরা করত। সেজন্য বাড়ির সকলেই তাকে উদয়শঙ্করের চেলা বলে ঠাট্টা করতেন।

রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে চান। কারণ আলো হবার আগেই ধানবাদ পৌঁছে যাওয়া ভাল। কিন্তু পথ খালি পাবার জন্য আমাদের ঘণ্টা-চারেক অপেক্ষা করতে হল। রাঙাকাকাবাবু তো ক্রমে ক্রমে বেশ অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। মেজদার তাড়াতাড়িই ঘুম পেত। বেশ খানিকক্ষণ রেডিও শোনা ও কথাবার্তার পর তিনি হাই তুলতে লাগলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলতে লাগলাম। মেজদা শুতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমিও বললাম—বাড়ি ফিরতে চাই। এরই মধ্যে দ্বিজুদা বা দ্বিজেন আমাকে বলে গেল, রাঙাকাকাবাবু আমাকে জানাতে বলেছেন যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যেন ডান দিকে মোড় নিয়ে এলেনবি রোড ধরে দক্ষিণে চলে যাই। মেজদা তো হাই তুলতে তুলতে উপরে চলে গেলেন। কিন্তু মুশকিল হল সেজদাকে নিয়ে—সেজকাকাবাবুর বড় ছেলে রঞ্জিত বা কার্তিক। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি বুঝতে

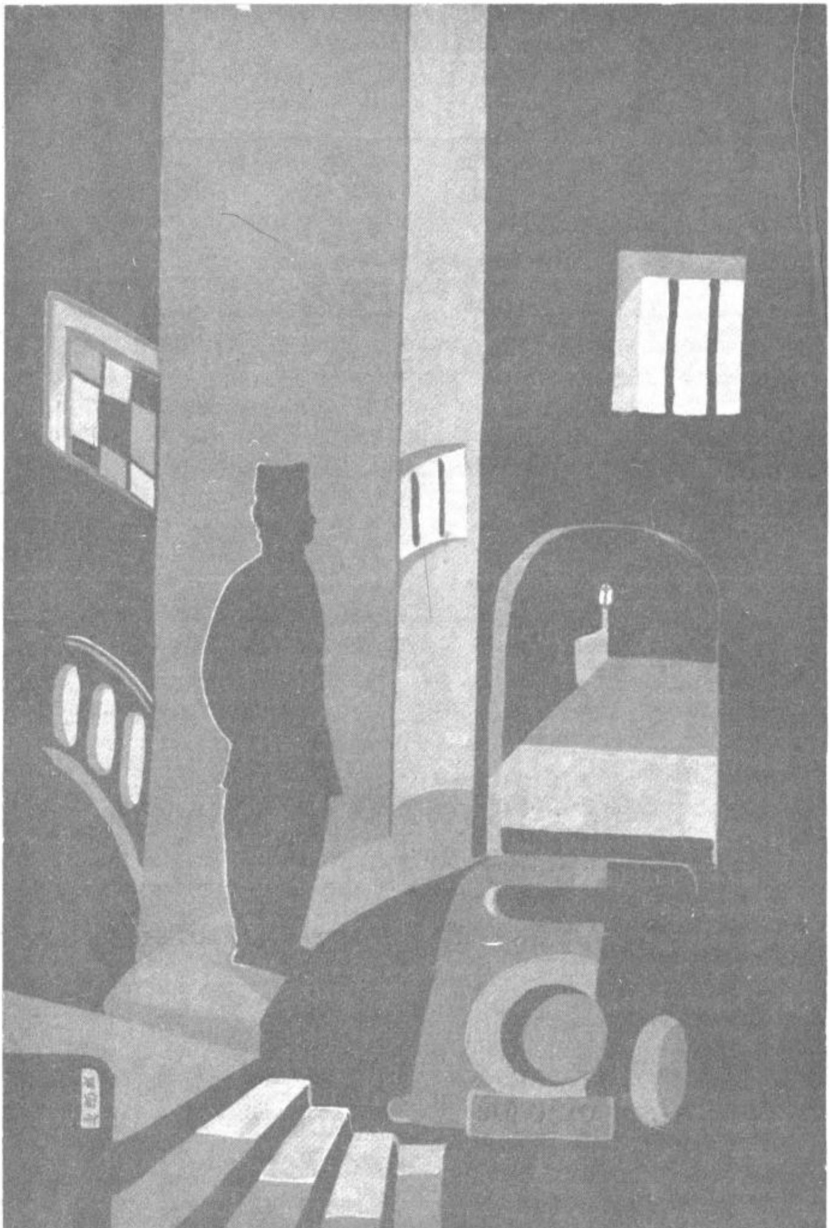

ছবি : কল্পনায় মহানিষ্ক্রমণ ঐঁকেছেন শর্মিলা বসু

পেরেছিলেন, অস্বাভাবিক কিছু-একটা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি এটাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত রাত পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে আমি কেন ও-বাড়িতে রয়েছি। সেজদা ক্রমাগতই দোতলার লম্বা বারান্দায় আর গাড়িবারান্দার ছাদে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। একবার তিনি তিনতলার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন দেখে আমিও জোর গলায় 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক' বলে বেশ আওয়াজ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। একটু পরে পা টিপে টিপে উপরে উঠে আসছি। দেখি সেজদাও তিনতলা থেকে নেমে আসছেন। ধরা পড়ে যাওয়াতে কী-একটা যেন ফেলে গেছি এ-রকম কিছু বলে সরে গেলাম। রমণীকে বলে দেওয়া হল, সে নীচের সদর দরজা বন্ধ করে শুতে যেতে পারে। সে তাই করল। দেখে নেওয়া হল যে, বাড়ির অন্য চাকর-বাকররা যে যার আস্তানায় চলে গেছে। কিন্তু সেজদা কিছুতেই ভোলবার নয়।

যখন রাত একটা বেজে গেল, রাঙাকাকাবাবু দ্বিজুদাকে বললেন সেজদাকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনতলায় শুতে যেতে। আর যদি সেজদা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে, তাকে বলতে যে সন্দেহ করলে তো রাঙাকাকাবাবুর মন্দ বই ভাল হবে না। সুতরাং সন্দেহ চেপে রেখে শুয়ে পড়াই ভাল। দ্বিজুদাকে আরও বলে দেওয়া হল যে, উপর থেকে রাস্তার দিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে এবং সেজদাকে ধরে রেখে ঠিক সময়ে বেশ জোরে গলা ঝাড়া দিতে। তার গলার আওয়াজ পেলে আমরা যাত্রা আরম্ভ করব।

চারিদিক নিস্তব্ধ। রাঙাকাকাবাবুর ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা সেকেণ্ড ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেছে। আমিও যেন আমার হার্টের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। সেই সন্ধ্যার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ পনেরো মিনিট যে কীভাবে কাটল ভগবানই জানেন। দেড়টার সময় দ্বিজুদার গলা-খাঁকারি শোনা গেল। রাঙাকাকাবাবু দরজার কাছের ঘেরা এলাকায় বেরিয়ে এলেন। সেই মুহূর্তে ছদ্মবেশে তাঁকে দেখে বেশ চমকেই গিয়েছিলাম। উত্তর ভারতের মুসলমান মৌলভির বেশে সুভাষচন্দ্র বসুর এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ। ঐ প্রকাশ কজনই বা দেখেছে! ইলার কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে 'গড্ ব্লেস ইউ' বলে আমাদের যাত্রা শুরু করতে বললেন। অরবিন্দ হোল্ড-অলটা তুলে নিয়ে আগে আগে চলল, তার পেছনে রাঙাকাকাবাবু, শেষে আমি। ততক্ষণে চাঁদ বেশ উঠেছে। রাঙাকাকাবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন দেওয়াল ঘেঁষে চলতে, যাতে ছায়া না পড়ে। পা টিপে টিপে চলতে হল। আগেই দেখেছিলাম, রাঙাকাকাবাবু কাবলি জুতোটা পরেননি, পরেছিলেন ইউরোপের মজবুত মোটা হীল্-ওয়ালা ব্রাউন রঙের ফিতে-বাঁধা জুতো। শেষকালে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে অনেক হাঁটতে হবে, কাবলি পরা তাঁর অভ্যাস নেই। ওটা পরে অত হাঁটতে পারবেন না। যে চশমা তিনি ব্যবহার করতেন সেটা রেখে গেলেন। সঙ্গে নিলেন বহুকালের পুরনো রোল্ড্ গোল্ডের ফ্রেমের চশমা, যেটা তিনি ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে ও দেশে ফিরে ত্রিশ দশকের প্রথমে পরতেন। বললেন, প্রয়োজনমতো হাঁটবার সময় চশমা পরবেন, অন্য সময় খালি চোখেই থাকবেন।

আমরা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে রান্নাবাড়ির মাঝখানের বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছলাম। কেউ কোথাও নেই, কোনো শব্দ নেই, শুরুটা বেশ নির্বিঘ্নে হবে বলে মনে হল।

রাঙাকাকাবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি পেছনে বসবেন। ব্যবস্থাটা ছিল যে, কোথাও যদি কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করে বা প্রশ্ন করে, আমি চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাকব—যেন মনিব। রাঙাকাকাবাবু আমার 'শোফার'-এর পার্ট করবেন। প্রয়োজন হলে তিনি চট্ করে বেরিয়ে এসে সেলাম ঠুকে কথাবার্তা শুরু করে দেবেন। আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম, চেহারা দেখে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে আমি মনিব আর আপনি আমার 'শোফার'? রাঙাকাকাবাবু উত্তরে আমাকে বলেছিলেন, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। চুপচাপ বসে থাকবে, আমি ঠিক অ্যাকটিং করে যাব!

পা টিপে টিপে তিনজনে রান্নাবাড়ির সিঁড়ির নীচে পৌঁছলাম। গাড়ি তো সামনেই রয়েছে। অরবিন্দ হোল্ড-অলটা সামনের বাঁ দিকের সীটে রেখে দিয়ে গেটের দিকে চলে গেল। আমি নিঃশব্দে গাড়ির পেছনের বাঁ দিকের

পারবেন কি রাখতে চুপি চুপি ?

কোনো কোনো মহিলা মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ এগিয়ে চলেন আর জীবনের সাধ আহ্লাদের সামগ্রীও জুটিয়ে ফেলেন।

ঐ কাজটি কি করে সম্ভব—কানাড়া ব্যাংক আপনাকে তা জানাতে পারে।

আপনিও ঐ রকম একজন মহিলা হতে পারেন।

কানাড়া ব্যাংক-এর **বালক্ষেম ডিপোজিট** স্কীম আপনার মত ঘরণীদের জন্যেই—যাঁরা সংসার খরচ থেকে প্রতিদিন অল্প টাকা বাঁচিয়ে চুপি চুপি জমা করতে থাকেন আর হঠাৎ একদিন তাঁর সংসারকে তাক লাগিয়ে দেন !

এমন কি ঘরে প'ড়ে থাকা সামান্য খুচরো পয়সাও আপনার **বালক্ষেম**-এর টি. ভি. বাক্সে চুপি চুপি ফেলে রাখা যায়। আপনি নিজেও জানেন না—আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজটির বিনিময়ে ঘরে আসছে অবাক করার মত এক ভাণ্ডার !

আপনার হাতে আসবে যথেষ্ট টাকা, যা দিয়ে কিনতে পারবেন নিজের জন্যে জমকালো একটি শাড়ী, ছেলের জন্যে সাইকেল অথবা সংসারের জন্যে বিশেষ কোনো সামগ্রী !

আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজের বিনিময়ে আসুন—বিরাট লাভ !

আমাদের অন্যান্য ডিপোজিট স্কীম : **কামধেনু, নিরন্তর, বিদ্যানিধি, সেভিংস, রেকারিং ও ফিক্সড ডিপোজিট।**

কানাড়া ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)
সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের 1,300-রও বেশি শাখা আছে

SERVING TO GROW · GROWING TO SERVE
CANARA BANK

maa (S) CB 15 a Ben 81

দরজাটা খুলে দিলাম। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে রাঙাকাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। এক মুহূর্ত পরেই আমি ইচ্ছা করে পায়ের বেশ আওয়াজ করে ড্রাইভারের জায়গায় বসলাম এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করলাম। পেছনের নিমগাছের ঘুমন্ত কাকগুলো চমকে কা-কা করে উঠল। সামনে চেয়ে দেখলাম গেটটা খুলে গেল। স্টার্ট নিতেও বেশ আওয়াজ হল। ওয়াণ্ডারার বেশ তেজের সঙ্গে যাত্রা শুরু করল। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। গেট পার হয়ে ডান দিকে ঘুরলাম, খানিকটা এগিয়ে আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে এলেনবি রোডে ঢুকে পড়লাম। ততক্ষণ রাঙাকাকাবাবু তাঁর পাশের দরজাটা ধরে বসে ছিলেন, যাতে দরজা বন্ধ করার দুটো আওয়াজ না হয়। দরজাটা তিনি বন্ধ করলেন, এক দুর্গম যাত্রা শুরু হল।

যাত্রা করার ব্যাপারে এক অদ্ভুত রকমের অনুভূতি আমার মধ্যে অনেকদিন কাজ করত। আমার মনে হত ঐ গোপন যাত্রার দুই নীরব সাক্ষী থেকে গেল—উডবার্ন পার্কের নীচের বারান্দার প্রহরী বাবার গ্র্যাণ্ড ফাদার ঘড়িটা আর এলগিন রোডের বাড়ির নিমগাছটা। দুই সাক্ষী যেন এখনও আমাকে বলে, আমরা কিন্তু জানি।

(ক্রমশ)

ফরাসি দেশের অধ্যাপক রিচার্ড ব্রেক্মিগনি জীবনে কখনো সর্বনাম ব্যবহার করেননি। কখনো "আমি বলছি" বা "তুমি শোনো" এভাবে কোনো বাক্য উচ্চারণ করেননি তিনি। নিজের সম্বন্ধে, "আমি যাচ্ছি" না বলে বলতেন, "রিচার্ড যাচ্ছে।" ১৯২৯ সালে সত্তর বছর বয়েসে রিচার্ড মারা যান। তাঁর জানাশোনা কেউই শোনেনি তাঁকে একটিও সর্বনাম উচ্চারণ করতে।

ছবির মজা

চার-চারটি পথ রয়েছে এখানে। ক খ গ আর ঘ। এই চার পথের কোন্ পথ ধরে এগোলে উপরের ওই লাইটহাউসে গিয়ে তুমি পৌঁছবে? আগে একটা আন্দাজ করে নাও, তারপর এগিয়ে দ্যাখো।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

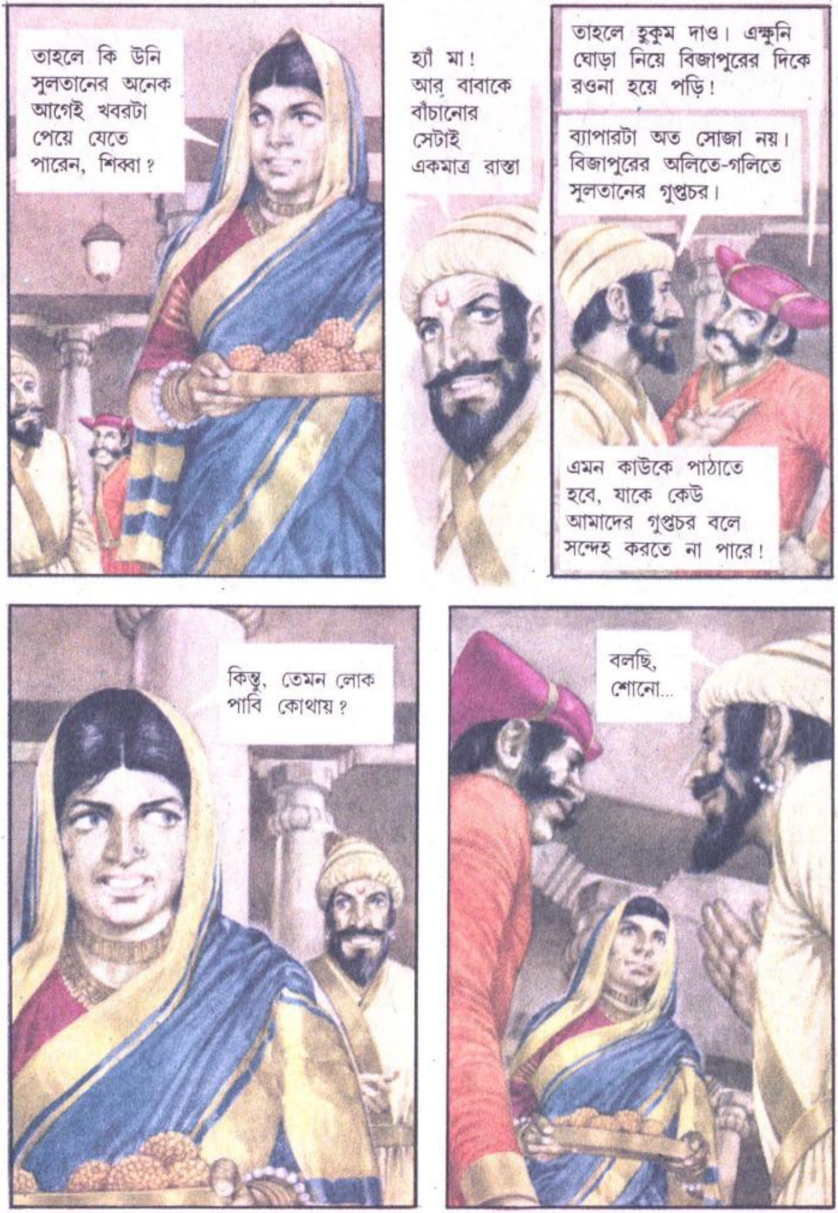

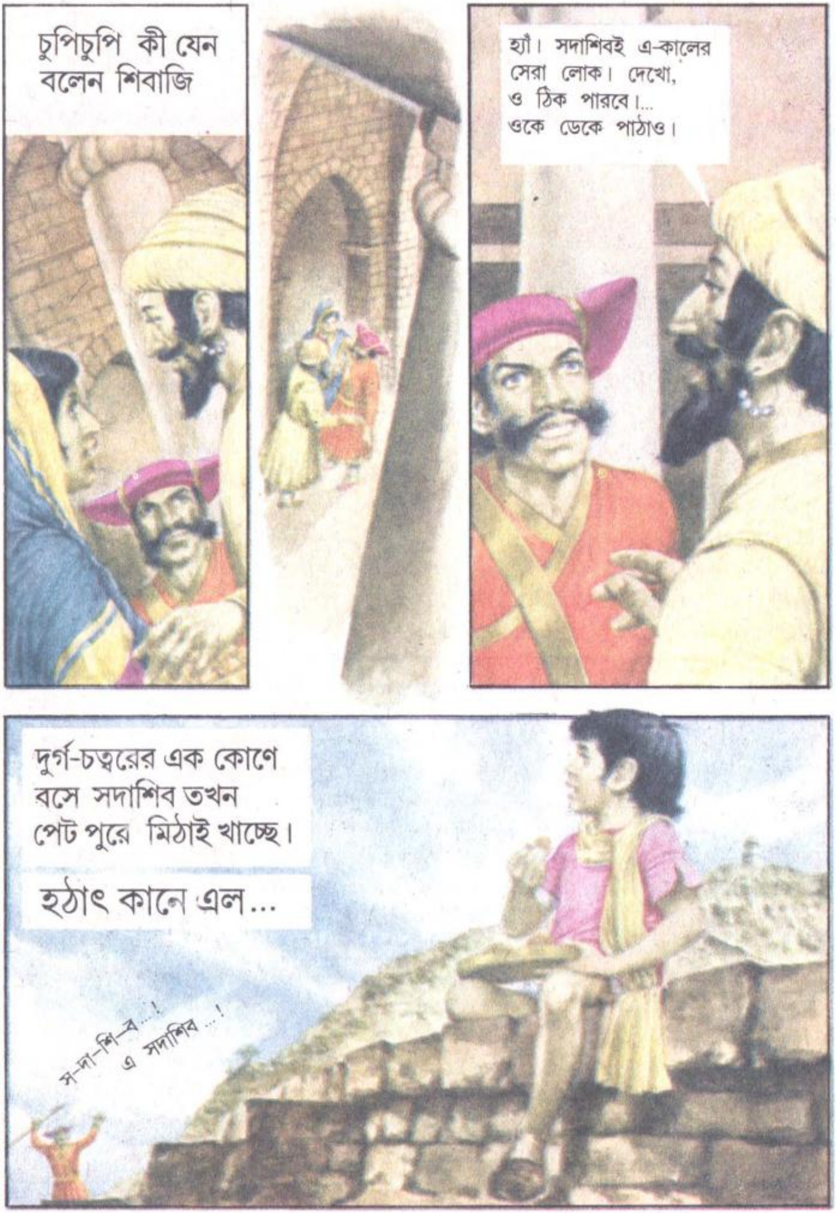

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
টাইনকাস্টারের বিরুদ্ধে খেলা…
বসরানের কোচ হবার দু কোটি টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও রয় দেখছে, বসরান অটল। এদিকে তার রোভার্স দল লীগের একটা খেলাও জেতেনি…
নাও লফটি… যাঃ
লফটির বদলে বিপক্ষের লোকের পায়ে বল তুলে দিয়েছে ডানকান
চার্লি বল আটকাতে পারল না!
গোল!
আবার গোল!
রোভার্স আজ ডুবেছে!
লফ্‌টি কেন এগিয়ে এসে বল ধরল না?
আর-একটু জোরে ঠেলা উচিত ছিল!
ঝগড়া কোরো না!
ঝগড়া করলে আরও ডুবব আমরা!
ঠিক বলেছ!
ডানকান উঠে এসে খেলছে!
লড়ে যাও ডানকান!
ডানকান এগিয়ে গেলে ট্যালবটকে সামলাবে কে?
ট্যালবটই ওদের সেরা স্ট্রাইকার!
হঠাৎ…
আরে!
ডানকানকে এখন পিছনে দৌড়তে হবে…
কিন্তু বল ততক্ষণে ট্যালবটের পায়ে…
গোল!
রোভার্স তিন গোলে হারছে!

খানিক বাদে আবার গোল!
আবার ট্যালবট!
ফোর নিল! ট্যালবট হ্যাটট্রিক
রোভার্সের সমর্থকরা হতভম্ব
রয়ই আমাদের ডোবাল!
এ তো ভাবাই যায় না!
ড্রেসিং রুমে···
ডানকান, তোমার বদলে এবার ট্রেভর ক্যাসিডি নামুক!
দোষ আমার নয়, তোমার! ওই বসরানের ব্যাপারটাই···
বসরানের ব্যাপার এটা নয়। তোমার বদলে···
ট্রেভর নেমে ট্যালবটকে সামলাবে!
দ্বিতীয়ার্ধে···
ট্যালবটের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকো, ট্রেভর!
একটু বাদে···
আরে···
ট্রেভর হেড করে ব্ল্যাকিকে বল দিয়েছে ···ট্যালবট হতাশ!
তারপরেই···
ব্ল্যাকি বল দিয়েছে ভার্ননকে···
গোলে পাঠাও ভার্নন!
শেষ মুহূর্তে রয়ের হেড···
শাবাশ রয়!
গো-ও-ও-ও-ল
চেঁচামেচির দিকে কান নেই রয়ের!
সব গোল শোধ করো। নয়তো আমি বসরানেই চলে যাব।
কিন্তু চার-চারটে গোল কি শোধ হবে?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

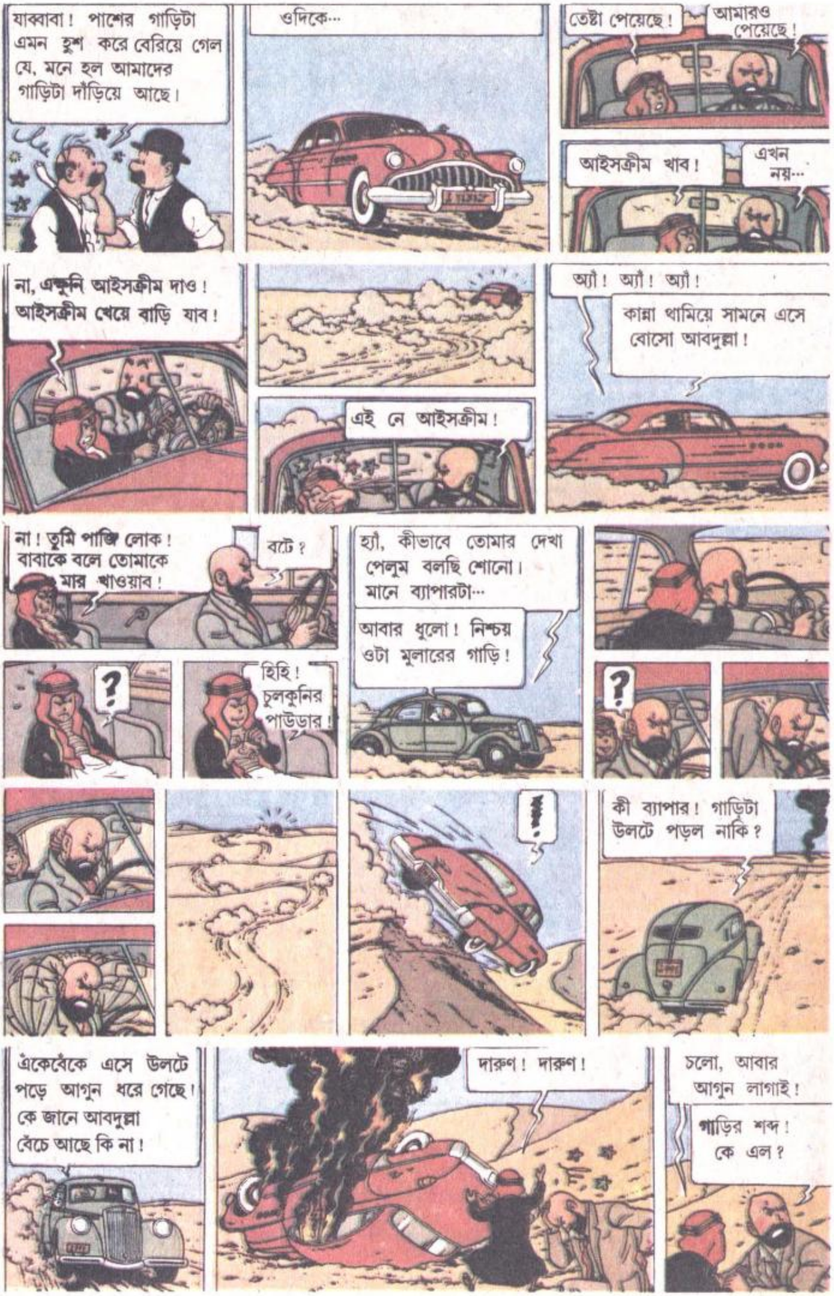

যাব্বাবা! পাশের গাড়িটা এমন হুশ করে বেরিয়ে গেল যে, মনে হল আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।
ওদিকে...
তেষ্টা পেয়েছে!
আমারও পেয়েছে!
আইসক্রীম খাব!
এখন নয়...
না, এক্ষুনি আইসক্রীম দাও! আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি যাব!
এই নে আইসক্রীম!
অ্যাঁ! অ্যাঁ! অ্যাঁ!
কান্না থামিয়ে সামনে এসে বোসো আবদুল্লা!
না! তুমি পাজি লোক! বাবাকে বলে তোমাকে মার খাওয়াব!
বটে?
হ্যাঁ, কীভাবে তোমার দেখা পেলুম বলছি শোনো। মানে ব্যাপারটা...
আবার ধুলো! নিশ্চয় ওটা মুলারের গাড়ি!
?
হিহি! চুলকুনির পাউডার!
?
কী ব্যাপার! গাড়িটা উলটে পড়ল নাকি?
এঁকেবেঁকে এসে উলটে পড়ে আগুন ধরে গেছে! কে জানে আবদুল্লা বেঁচে আছে কি না!
দারুণ! দারুণ!
চলো, আবার আগুন লাগাই!
গাড়ির শব্দ! কে এল?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭	■	৮	
	■	৯			■	
■	১০	■		■	১১	■
■		■		■		■
১২		■		■	১৩	১৪
	■	১৫			■	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সোনালি ফুল। (৩) গানবাজনার আসর। (৬) সূর্য। (৮) নাচগানের পক্ষে কোন্ ফল দরকারি? (৯) সিংহের শোভা। (১২) সঙ্গে পুরুষ থাকলেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা। (১৩) মিটমাট। (১৫) বাগান।

উপর-নীচ : (১) অনটন। (২) শরীর। (৪) আশ্রয় ছাড়া যা উপরে উঠতে পারে না। (৫) দুমুখো ওষুধ। (৭) এক দেবীর দশ রূপ। (১০) মেওয়া ফলে কিসে? (১১) সুগ্রীব রামের কী ছিলেন? (১২) পঙ্‌ক্তি বা সারি। (১৪) পেলে সবাই খুশি হয়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ম	ং	পু	■	ক	র্ণি	ক
থ	■	লি	■	ল	■	ষ্টি
■	ই	শ	কা	প	ন	■
■	লো	■	লা	■	ব	■
তা	রা	■	পা	■	নী	প
ল	■	মা	নি	ক	■	ট
ব্য	ঞ্জ	ন	■	মা	লি	কা

ধাঁধা

দেরি যে হবে, ছোট্‌কা বলেই গিয়েছিল। অফিসে দিল্লি থেকে কারা সব আসবে, তাদের সঙ্গে সন্ধেবেলা মীটিং না কী আছে, আগের দিন রাত্রেই ছোট্‌কা বলছিল সেজদাদুকে।

ছোট্‌কা যখন ফিরল, তখন আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ। সেজদাদুরা সবে খেতে বসেছে। ছোট্‌কা এসে ওখানেই বসল, তবে খাবার টেবিলে নয়, পাশেই একটা মোড়া টেনে নিয়ে, তার ওপর। টাইটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল,

"চট করে ওপরে রেখে এসো তো সতুবাবু। ফিরলেই একটা ধাঁধা পাবে।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলাম ওপরে, ছোট্‌কার ঘরে টাইটা রেখে আসতে। ফিরে এসে বললাম, "ধাঁধা দাও এবার।"

ছোট্‌কা দেখি সেজদাদুর দিকে তাকিয়ে মজার মুখ করে হাসল একবার। সেজদাদু বলল, "এ-ধাঁধা মুখে-মুখে হবার নয়, কাগজ-কলম কোথায় তোমার, লিখে ফেলো, খেয়েদেয়ে আমরাও চেষ্টা করব।" কাগজ-কলম আনতে আর ক'মিনিট! আমি লিখে ফেললাম। সেজদাদু তো চেষ্টা করবেই, তোমরাও দ্যাখো-না, উত্তর করতে পারো কি না!

প্রথম ধাঁধা ॥ এক দঙ্গল অফিসার এসেছেন দিল্লি থেকে। অফিসের গেস্ট হাউসে গোনাগুনতি ঘর। হিসেব করে দেখা গেল, প্রত্যেক অফিসারকে একটা করে ঘর দিতে গেলে চারটে ঘর কম পড়ে যাচ্ছে।

তখন ঠিক হল, একেক ঘরে দুজনের থাকার ব্যবস্থা হবে। সেই অনুসারে দেখা গেল, চারটে ঘর ফাঁকা পড়ে থাকছে।

বলতে পারো, কজন অফিসার এসেছেন দিল্লি থেকে, ঘরই বা কটি সেই গেস্ট হাউসে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা সংখ্যা বলতে পারো, যে-সংখ্যাকে ইচ্ছেমতন যে-কোনও সংখ্যা দিয়েই গুণ করো না কেন, গুণফল যা হবে, সেই গুণফলের অঙ্কগুলো যোগ করে-করে গেলে চূড়ান্ত যোগফল হবে সেই প্রথম সংখ্যাটা?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ আগে-পরে অক্ষর বসিয়ে একটা অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি করো তো—

—নমা—

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১৬ টাকা। (২) FACETIOUSLY অথবা ABSTEMIOUSLY। (৩) বিপল হল পল-এর ১/৬০ ভাগ।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টিউবওয়েলের মুখের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ বইতে বিনি পয়সায় বাসে চড়ার কায়দা লেখা আছে?

উঃ অমনিবাসে।

প্রঃ ও কণ্ডাক্টর-ভাই, এ যে দেখছি গড়িয়া এসে গেল। আপনাকে না বলেছিলাম, যাদবপুর এলে আমাকে নামিয়ে দিতে?

উঃ আপনিই বলেছিলেন? এখন বুঝতে পারছি, যাঁকে যাদবপুরে জোর করে নামিয়ে দিলাম, তিনি কেন নামতে চাইছিলেন না।

প্রঃ এখন বলছেন ভাল ঘুমের জন্যে দুধ আর ফল খেয়ে শুতে, ছ'মাস আগেই না বলেছিলেন একদম খালি পেটে শুতে?

উঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে ভীষণ তাড়াতাড়ি উন্নত হচ্ছে।

সুসেন

মজার খেলা

এটাকে মজার খেলা না বলে, বলা ভাল, মজার ম্যাজিক। উপকরণ তেমনকিছু দরকার নেই, শুধু একটি দেশলাইবাক্স, তবে দরকার সামান্য একটু প্রস্তুতি।

আগে খেলাটা বলি, তারপর কৌশল।

একটা ভর্তি দেশলাইবাক্সকে উলটো করে ধরে যদি ভেতরের ড্রয়ারটাকে বাইরে টেনে এনে, উলটো করেই ধরে থাকো, তাহলে কী হয়? কাঠিগুলি সব টেবিলে ছড়িয়ে পড়ে, এই তো? কিন্তু এ খেলায় তা হচ্ছে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে মন্ত্রবলে উড়িয়ে দিয়ে, তুমি দেখাচ্ছ যে, একটি কাঠিও পড়ছে না, অথচ উলটো করেই ড্রয়ারটাকে ধরেছ তুমি। এবং একটু পরে, বন্ধুরা যখন ভাববে, কাঠি আদৌ নেই, তুমি টেবিলে সব কটা কাঠিই ছড়িয়ে দিচ্ছ।

এবার কৌশল। ১ নং ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে কৌশলটা কী। একটা কাঠিকে ভেঙে দেশলাইবাক্সের খোলের ঠিক মাঝ-বরাবর কীভাবে রাখা হয়েছে দ্যাখো, এটাই কৌশল। এটা আঁট হয়ে লেগে আছে, তাই কাঠিগুলো পড়ছে না। তা বলে এই অবস্থায় তো বন্ধুদের হাতে দেওয়া যায় না। তাই খেলাটা দেখে তারা যখন হতবাক, তখন উলটো অবস্থাতেই একটা আঙুল দিয়ে কাঠিটাকে নাড়িয়ে সোজা করে দাও, সব কাঠি ঝুরঝুর করে টেবিলে পড়ে যাবে। ভাঙা কাঠিটাও। কৌশল তখন পুরোপুরি লোপাট।

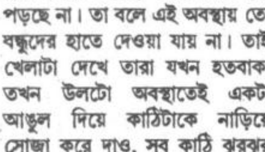

মজারু

হাসিখুশি

"বলো তো বুকুন, ইংরেজি কোন্ মাস আঠাশ দিনে হয়?"

"জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর—বারো মাসেই আঠাশ দিন আছে স্যার।"

"কী ব্যাপার বলো তো, আমি আজকাল ঘুমের মধ্যে কেমন যেন আবছা-আবছা স্বপ্ন দেখি।"

"অত চিন্তার কী আছে, ক-দিন চশমা পরে ঘুমোও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মাস্টারমশাই বললেন, "তুমি তো খুব বাংলা শিখেছ বুকুন। 'প্রতিশব্দ' কথাটার মানে কী বলো তো।"

বুকুন ঢোঁক গিলে বলল, "প্রতিশব্দ স্যার তাকেই বলে, যা আসল শব্দের বানান ঠিকমতো না-জানার জন্য ব্যবহার করা হয়।"

"জলেও থাকে, ডাঙাতেও থাকে—এ-রকম একটা প্রাণীর উদাহরণ দিতে পারো বুকুন?"

"পারি স্যার, কচ্ছপ।"

"এ-রকম আর-একটা প্রাণীর নাম বলো তো।"

"আর-একটা কচ্ছপ।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

হাতি-ধরিয়ে নায়ার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পালখোড়ের ছেলে নায়ারের জন্ম যেন হাতি ধরার জন্যেই। নতুন কিছু নয়। নানা হাতি ধরত। সেবা-যত্ন করত নানি। বাপ-চাচা ধরত। মা-চাচি তার মুখে তুলে দিত খাবার। ভুষি, গুড়, থোড়, ঘাস এইসব। হাতি হত তাদের পালিত্। রাজা-রাজড়াদের আমল থেকেই কেরালার তেকড়ি, উমাড়ি, কাছিতোড, বার্লিয়ার, পারচেকুডম প্রভৃতি জঙ্গল থেকে হাতি ধরা হত। তখনকার দিনে জঙ্গলে হাতির কোনও গোনাগুনতি ছিল না। রাজকাজে ছাড়াও, পরবর্তী সরকারের কম্মে লাগার পর, লকড়ি টানার কাজে হাতিই ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। আজও আসাম ও উত্তর বাংলায় এই হাতিই জঙ্গল থেকে কাঠ রেল-ওয়াগনে ভরে দেয়, লরি ভরাট করে। দক্ষিণী হাতি সারকাসেও বড় কম নেই।

নায়ারের পুরো নাম কে কুট্টন নায়ার। বয়েস ৫৪। মধ্য প্রদেশের বান্ধবগড় ওয়াইলড লাইফ স্যাংকচুয়ারির হাতি-ট্রেনার। পাঁচ-পাঁচটি হাতি এখন তার হেপাজতে। দাঁতাল গোধনই দলের একমাত্র পুরুষ। বাকি চারজন—লতা, কল্যাণী, তারামতি আর তুফান মাদা। লতার বয়েস ৪০, কল্যাণীর ৫০। বাকি দুই, গোধনসুদ্ধ ১৮-১৯।

বারলিয়ার জঙ্গল থেকে ধরা পাঁচ-পাঁচটি হাতি মধ্য প্রদেশ সরকার কেরল থেকে কিনলেন। হোসেঙ্গাবাদে কাঠ বওয়ার কাজ তাদের। সেই তাদের সঙ্গেই দেশ ছাড়ল নায়ার। আর দেশে ফেরেনি। হোসেঙ্গাবাদ থেকে কানহায়। মাহুত নায়ার হাতি চড়িয়ে কানহার জঙ্গলে শের দেখিয়ে বেড়ায় ট্যুরিস্টদের। সেখান থেকে বান্ধবগড়ে এই বছর-চারেক।

এদিককার সমস্ত অভয়ারণ্যই ১ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলার কথা। আমরা দিন-তিনেক আগে পৌঁছে বনপাল ভজিয়ে উমারিয়া থেকে বান্ধবগড়ে এসে পড়েছি। দখল নিয়েছি বাংলোর। কাঁচা সবজি আর চাল ডাল নুন বয়ে এনেছি। লকড়ির তো অভাবই নেই। চমৎকার চার-ঘরা কাঠের বাংলো। মাঝে ড্রইং-ডাইনিং। প্রধানত আমলকী বনের মাঝখানেই আমাদের বসবাস। অ্যাসবেসটসের ছাদ ভরা মুন ফ্লাওয়ার। সামনে করমচা ঝোপ। মরামের রাঙা পথ দিগ্‌বিদিকে বেরিয়ে গেছে। কাঁক্করের ডাকে ঘোর কাটে। একটা ঝিম-ধরানো ভাব সর্বত্র। সেই ভাবের কাঁথা সেলাই করে উড়নচণ্ডি ঝিঝি।

হাতে আমাদের একটা ভাড়া-করা সাদা অ্যামবাসাডার। জব্বলপুর থেকে আজ দিন-দশেক হল ট্যাঙশ-ট্যাঙশ করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মারবেল-সফেদ গাড়ি। জঙ্গল কিন্তু

এসব গাড়ির কদর করে না। তার চাই জিপ-জোঙ্গা। পাব কোথায়? এখনও সীজন শুরু হয়নি। গাড়িঘোড়া হুজুরে হাজির নয়। হাওদায় রং পড়ছে। বাথরুমে গিজার আঁটা হচ্ছে। কট্‌গুলো হচ্ছে রং-এ রং-এ রঙিন। দেয়ালে নতুন ডিসটেম্পার। জঙ্গলে একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে।

দুপুরের খাওয়া সারা। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। নায়ার পুরনো হাওদা গোধনের পিঠে চাপিয়ে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। আমরা তড়িঘড়ি তৈরি। বাংলোর পেছন দিকে গোধন আমাদের নিয়ে জঙ্গলে।

আকাশের কোণে হালকা ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ। নায়ারের বাঁহাতে ডাঙশের বদলে একটা টাঙিকছমের জিনিস। পড়লুম গিয়ে ঘাসের সমুদ্রে। কোমর-উঁচু বাঘ-ঘাসের ভেতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল গোধন। ঘাস খুঁড়ে চলেছে নায়ারের সতর্ক দুচোখ—এদিকে-ওদিকে। বলল, এই ঘাসবনই হল আসল টাইগার-কভার। বাঘ এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিণের ওপর। হরিণ ছাড়া, বাগে পেলে বুনো শুয়োর। বাচ্চা মোষ বা বাছুরের মাথা এখানে-ওখানে। ইতস্তত হাড়—বিশেষ করে ঘাসের বিছানা যেখানে দড়ি-দোলনার খোলের মতন হয়ে আছে, সেখানে। নায়ার বলে, বনরাজের বিছানা। উনি শুয়ে-বসে খান। প্রায়ই 'কিল'-এর ব্যবস্থা থাকে। বাছুর মোষ বাঁধা হয়। পর্যটক দ্যাখে ঐ অবস্থায় 'অ্যালার্ম কল' দেয় বাঁদর-হনুমান গাছের চুড়ো থেকে। সেই আওয়াজ আরো দীর্ঘ জোরালো করে টেনে দেয় চিতল, কৃষ্ণসার। জঙ্গল এক অজানা অথচ নিশ্চিত ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ একটা ঝাঁঝালো গুমোট গন্ধ নাকে ঝাপ্‌টা মারে। নায়ার ঠোঁটে আঙুল তুলে সতর্ক করে আমাদের। কাছাকাছি বাঘ আছে, আছেই। নায়ার তার গোধনকে খুব হুঁশিয়ার করে দেয়। কেঁদ পলাশ বয়ড়ার ঝোপের মধ্যে পর-পর চারটে চিতল। পথে যেখানে পাতা পড়েনি, সেখানে মাটি-বালির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ বা পাগ-মার্ক দেখে বুঝে নেয় নায়ার, বাঘ কোন্‌দিকে গেছে। মার্ক নতুন, না পুরনো—তাও বুঝে নেয়। আর সেইমতো গোধনকে চালনা করে।

প্রকৃত কোনও পথ নেই জঙ্গলে। বিশেষ করে হাতির জন্যে। সে পথ করে নেয়। নির্দেশ পেলে একটা ষাট-সত্তর ফুট কেঁদ গাছ উলটে দিতে দু সেকেণ্ড। বাঁশ আমলকী বুনো কুলের ঝোপের পাশ দিয়ে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বেড়াল গোধন ঘণ্টা-দুয়েক। সম্বার দেখলুম, হরিণ দেখলুম কতশত, শেরের দেখা নেই। শের মেলে ভাগ্যে। নায়ার আমাদের বাংলোয় নামাল সন্ধে-সন্ধে। বলল, "কাল সুবে পাঁচ বাজে আপলোগ রেডি হো যাইয়ে। শের জরুর মিলনা চাই।"

ঘোড়ার যেমন লাগাম, গাড়ির স্টীয়ারিং, হাতির কী? হাতির দু-দুটো কুলো-কানের ওপরে মাহুতের পায়ের পাতা। কাজ করে দুটো

অনেক বড় কলকাতার ছবি

আমরা সকলেই জানি সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরের পত্তন। প্রথম নাম সুতানুটির অর্থ সুতার গুটি। অর্থাৎ সুতো বিক্রীর কেন্দ্র ছিল এই এলাকাটি। এতো গেল কলকাতার আদি যুগের কথা। এরপর ব্রিটিশ রাজত্বে কলকাতার নাম ডাক সারা বিশ্বে একটা বিশাল বড় বাজার হিসেবেই পরিচিতি পেল।

এবারে কলকাতার বাজারগুলোর চেহারা নিয়ে একটু ভাবা যাক। শহরের মধ্যে বড় বড় পাইকারী বাজারের ছড়াছড়ি। ফলে, লোক, গাড়ি, ঘোড়া, ভীড় আর জ্যাম।

কিছুদিন হ'ল শহর কলকাতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ। সেটা আর কিছুই নয় কলকাতা শহরের কেন্দ্রমুখী ভীড়টাকে ছোট ছোট উপনগরী তৈরী করে ভেঙ্গে দেওয়া। এই উপনগরীগুলি হবে মোটামুটিভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ এক একটা ছোট্ট শহরে এলাকা। ফলে বাইরে থেকে বা কলকাতার লোকেদের কেনা-বেচা করতে এই পুরানো কলকাতায় এসে ভীড় করতে হবে না। শুধু বাজার হাটই নয় অফিস, কাছারি, স্কুল কলেজ, সিনেমা, ব্যাঙ্ক, ফায়ারব্রিগেড ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই উপনগরীগুলিতে পাওয়া যাবে।

কলকাতাকে বাঁচাতে হলে, কলকাতার ব্যবসাকে জিইয়ে রাখতে হলে মহানগরীতে এরকম অনেক উপনগরী গড়ে তুলতে হবে। সল্ট লেক বা বিধাননগরে তো তোমরা অনেকেই গিয়েছো। ঐ যে যেখানে ঝিলমিল আছে না? এরকম আরও উপনগরী তৈরী হচ্ছে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে এবং কসবার পিছনে পূর্ব কলকাতায়। কল্যাণীর নাম শুনেছো তো? কল্যাণীও কলকাতার আর একটা উপনগরী। সেটাও যাতে জম-জমাট হয়, তার জন্য সি.এম.ডি.এ চেষ্টা করছে।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ
৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত)

বুড়ো আঙুলই। কিসের জন্যে, কেমনধারা চাপ—জেনে গেছে হাতি। শের কী পাঞ্জা মাহুতই বোঝে, হাতি নয়। যেভাবে চলতে বলবে, সেভাবেই চলবে হাতি। অন্যথা নেই।

"বয়েস কীভাবে বোঝো?" নায়ারকে জিজ্ঞেস করি।

"কান দিয়ে। বয়েস যত বাড়ে, কুলোকান তত মুড়তে থাকে। এছাড়াও, পাঞ্জার বেড় দিয়েও বয়েস আঁচ করা যায়।"

"মোটামুটি বাঁচে কতদিন?"

"একশো-বিশ তো হোবেই। জ্যায়দা ভি হো সক্‌তা।"

নায়ারের বউ কল্যাণাম্মা। হাতির খাওয়া-দাওয়া সমস্ত তারই হাতে। এক নাতিন আছে ঘরে। সেও নানির সঙ্গে হাতির সেবা-যতন করে। কল্যাণাম্মা খেতে না দিলে সেদিন সবার খাওয়া-দাওয়া বন্‌ধ। ৩৪ বছর স্বামীর সঙ্গে এই একই কাজ সে করে যাচ্ছে। খাবার ব্যাপারটাও বড় আশ্চর্যের। ধরো, দশ কিলো চালের ভাত খায় রোজ। তুমি একদিন পরীক্ষা করার জন্যে এগারো কিলো চাল নিলে। ভাত করলে। খেতে দিলে। ঠিক কিলোটাক ভাত বালতিতে পড়ে থাকবে। তোমার আমার মতন না, দু পদের বদলে দশটা পদ হলে কণ্ঠা পর্যন্ত খেয়ে নিলুম। তারপর কুমড়ো-গড়ান।

আরও একটা অদ্ভুত কথা বলল নায়ার। ধরো, তুমি চা-দোকানের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে চা খেতে দোকানে ঢুকলে। গোঁসা হবে। অথচ, হাতির ওপরে বসে খাও। কিচ্ছু মনে করবে না। ওর মান-অপমানবোধ অত্যন্ত কড়া। ভালবাসা, মাহুতের জন্যে, পুরোটাই জমা থাকে। খরচ হয় না।

নায়ার মাইনে পায় আড়াইশো টাকা। বললুম, "ধরো যদি তুমি অনেক টাকা মাইনের একটা চাকরি পাও, হয়তো শহর-বাজারে। তুমি যাবে?"

"কভি না, বাবু। মরেঙ্গে, তব ভি এ-কাম নেই ছোড়েঙ্গে।" কেরলের জিভ হিন্দি নাড়াচাড়া করতে করতে উত্তর দিল। চাকরি শেষ হলে, করবেটা কী? "দেশ যাব। জঙ্গলে ঘুরব-ফিরব। হাতি ধরব। সরকারকে দিব। না ধরতে দিলে, হাতি ট্রেন করব, সরকারে-বেসরকারে। লগ টানা কাজে হাতির এখনও বহুত কদর, বাবু।"

আমার ভাই

পিংকু আমার ভাই
খেলনা তাহার চাই
সেই খেলনা কিনতে আমি
বড়বাজারে যাই।
ভাইকে দিলাম খেলনা
ভাই নয় যে ফেলনা
ভাইকে ভালবাসতে হয়
তাতেই সুখ সবাই কয়

অভীককুমার মণ্ডল (বয়স ৭)

পাখির ছানা

আমার মামাবাড়িতে একটা চড়ুই পাখির বাসা ছিল। সেই বাসাতে দুটো ছোট ডিম ছিল। কয়েক দিন পরে দেখি, ডিম ফুটে দুটো ছানা বেরিয়েছে। তাদের ছোট-ছোট দুটো ডানা। তারা একদম উড়তে পারত না। সবসময় কিচ্-কিচ্ শব্দ করত। তাদের মা মুখে করে খাবার এনে ছানাগুলিকে খাইয়ে দিত। দেখে আমার খুব ভাল লাগত।

কিছুদিন পরে দেখি, তারা একটু-একটু উড়তে পারছে। হঠাৎ একদিন দেখি, তারা উড়ে গেছে। বাসা খালি। তাই দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

শর্মিষ্ঠা পাল (বয়স ৭)

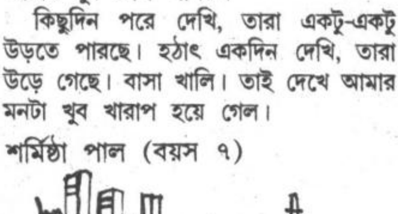

পাতাল রেল

পাতাল রেল পাতাল রেল
মাটির নীচে মজার রেল
তুমি চলবে নীচে দিয়ে
আমি চলব ওপর দিয়ে

চৈতালি বসু (বয়স ১০)

ভোরের ছবি

আজ ভোরবেলায় এক নতুন দৃশ্য দেখলাম। মাঠে শুধু বাছুররা ঘাস খাচ্ছে, একটাও বড় গরু নেই। তাদের গায়ের রঙ লাল্‌চে। হঠাৎ এক দল মোষ এসে হাজির। রোদ্দুর পড়ে তাদের গা চক্‌চক্ করছিল।

আকাশটা যেন মাটিতে ঠেকে গেছে। দূরে অর্ধেক তৈরি সব বাড়ি। একটু পরে বৃষ্টি নামল। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের কোণে সরু রাস্তা ঠিক সাপের মতো হয়ে গেল। বাছুরগুলো ছুটে পালাল, কিন্তু মোষগুলো বৃষ্টিতে ভিজেই ঘাস খেতে লাগল।

আস্তে আস্তে দূরের হলুদ বাড়িটা আরও ফ্যাকাশে আর সারা মাঠ আরও সবুজ হয়ে গেল।

মোম সান্যাল (বয়স ৬)

আমাদের আমগাছে

আমাদের আমগাছে
ঠিক দুকুরবেলা
ছোট-বড় পাখিদের
বসে যেন মেলা।

কিচিরমিচির সুরে ভরা
হাসি গান গায়
সন্ধেবেলা দল বেঁধে
ঘরে ফিরে যায়।

জ্যোৎস্না দে (বয়স ৬)

ভোরবেলায়

মোরগ মোরগ আরও ডাক্
সবার ঘুম ভেঙে যাক্
সুয্যিমামা উঠছেন
বাবা এখনও ঘুমোচ্ছেন।

শুভজ্যোতি ঘোষ (বয়স ৮)

বকুনি খেয়ে তুলি ভাল হয়ে গেছে

সুসান চক্রবর্তী বয়স ১৩

আমার তুলোর মতো সাদা বিড়ালটার নাম তুলি। তুলি সব সময় আমার পেছন-পেছন ঘোরে। রাত্তিরে আমার বিছানায় শোয়। দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু খায় না। আশ্চর্য! মাছে ওর অরুচি।

সেদিন সকালে আমার মা দুধের ডেকচি খোলা রেখে কার সঙ্গে যেন গল্প করতে গেছেন। এই ফাঁকে তুলি সব দুধ চুরি করে সাবাড় করে দিল। মা বুঝতে পেরে তুলিকে ধমক লাগালেন। বকুনি খেয়ে মন খারাপ করে তুলি আমার টেবিলের নীচে এসে বসল।

পরদিন সকাল থেকে তুলিকে পাওয়া গেল না। বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজলাম, ওর নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু তুলিকে কোথাও পাওয়া গেল না। তুলির কথা ভেবে আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। সন্ধের দিকে হঠাৎ দেখি ছাতের ঘরে তুলি চুপ করে বসে আছে।

এই ঘটনার পর থেকে তুলি খুব লক্ষ্মী হয়ে গেছে। ও আর কখনও দুধ চুরি করে খায়নি।

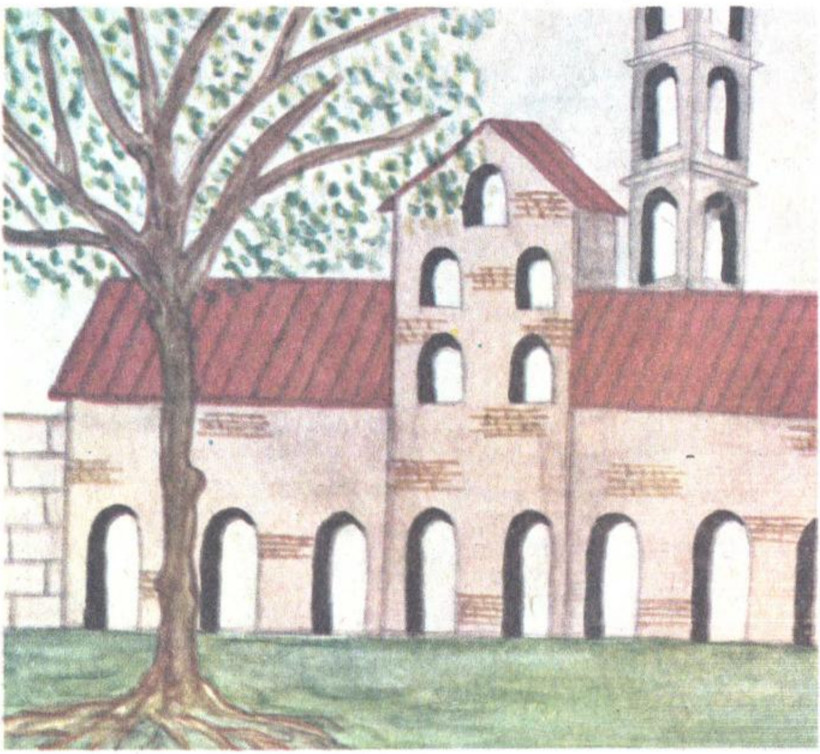

ছবি: সৌম্যব্রত বসু বয়স ১২

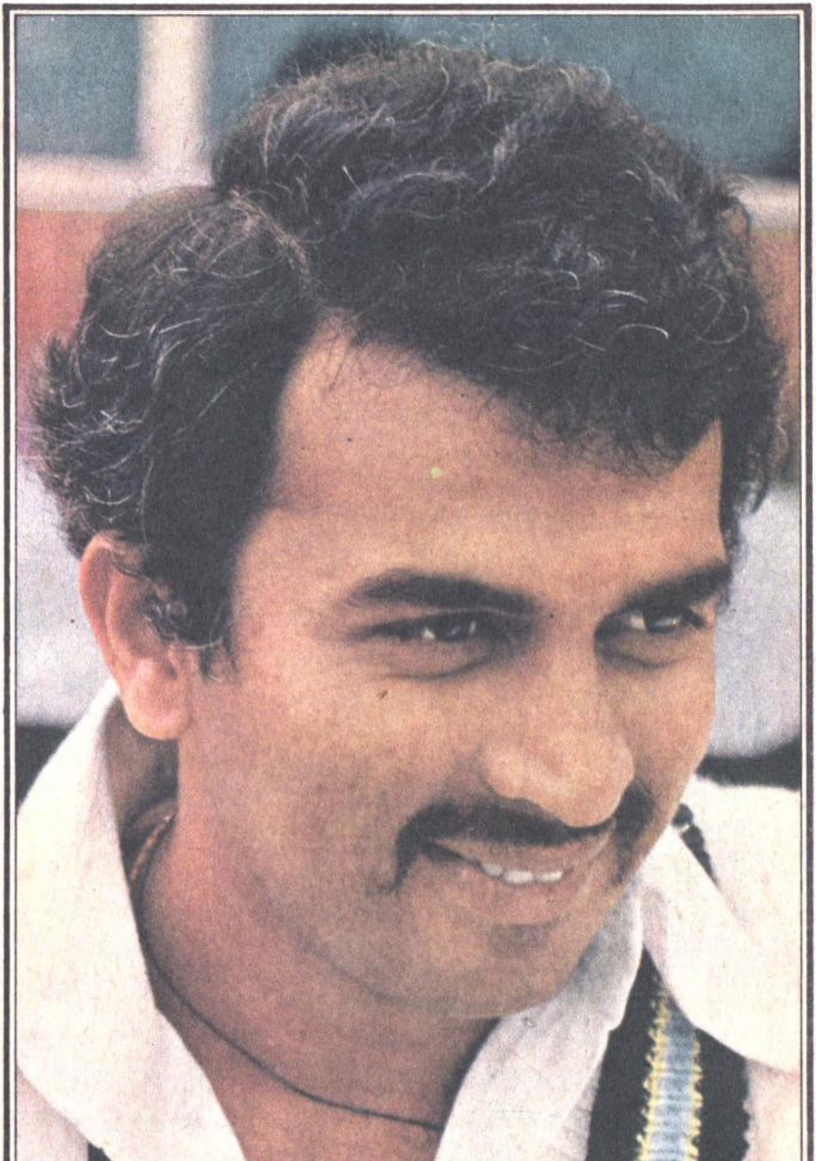

সুনীল গাভাসকার ফোটো: প্যাট্রিক ইগার (পাতা ওলটালেই ২৪তম সেঞ্চুরির খবর)

সুনীল, ২৪

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

অবশেষে সুনীল তাঁর দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করলেন।

না, কমলালেবুর রস পান করে নয়। বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে। উনিশ শো আশির সতেরোই জানুয়ারি মাদ্রাজের চীপকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৩তম টেস্ট সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন সুনীল। আর বাঙ্গালোরে ওই ২৪তম সেঞ্চুরিটি করেছেন একাশির তেরোই ডিসেম্বর। মাঝে ছশো পঁচানব্বইটি দিন কেটে গেছে। মানে পাক্কা এক বছর এগারো মাস পাঁচ দিন! সুনীলের মতো ব্যাটসম্যানের পক্ষে এতটা সময় টেস্ট-সেঞ্চুরিবঞ্চিত হয়ে থাকাটা উপবাস ছাড়া আর কী?

মাদ্রাজ আর বাঙ্গালোরের টেস্ট দুটির মাঝখানে যে জুবিলি টেস্টটি ও দুটি সিরিজ (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে) গেছে তাতে সেঞ্চুরি না পাওয়া ছাড়াও সুনীল খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। সুনীল নিজেই তা স্বীকার করেছেন কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

ব্যাপারটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। মাঝে-মাঝে ক্রিকেটারদের ওরকম দুঃসময় যায়। তবুও এতদিন সেঞ্চুরি না পাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছে। এটাই প্রমাণিত করে, সুনীলের কাছে ক্রিকেট জগতের কী বিরাট প্রত্যাশা। অন্য কোনও ব্যাটসম্যান যদি বছরে একটা সেঞ্চুরি করেন, তাহলে এত কথা ওঠে না। কিন্তু তাই বলে সুনীল? না, তা চলবে না! সুনীলকে যে-মিনারে ক্রিকেট অনুরাগীরা বসিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকে চট করে তাঁকে নামানো যায় না। কাজেই সেঞ্চুরি করতে না পারলে তার ফল তাঁকে ভোগ করতেই হবে!

যাক। সুনীল আবার যখন সেঞ্চুরি পেয়েছেন, তখন অন্য যে-সব প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলো আলোচনা করা যাক। প্রথম কথা, সুনীলের সেঞ্চুরি-ক্ষুধা নতুন করে জেগে উঠবে তো? কারণটা খুবই স্পষ্ট। সুনীলের বহু টেস্ট-রেকর্ড বা বিশ্ব-রেকর্ড আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ নতুন রেকর্ডটা তিনি সবচেয়ে বেশি করে করতে চাইছেন? অবশ্যই টেস্ট-সেঞ্চুরির তালিকার শীর্ষে থাকা। টেস্ট-সেঞ্চুরির সংখ্যার দিক থেকে সুনীলের চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু সোবার্স (২৬) ও ব্র্যাডম্যান (২৯)। সুনীল কোনওদিন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কি না, এ বিতর্ক এক বছর আগেও চলত। কিন্তু সাময়িকভাবে সুনীলের ফর্ম পড়ে যাওয়ায় প্রসঙ্গটা কিছুদিন চাপা ছিল। এখন সুনীল-অনুরাগীরা নতুন উদ্যমে একটি পুরনো আশাকে লালিত করার সুযোগ পেলেন। সুনীল পারবেন কি না, সে প্রশ্ন এখন নিরর্থক। তবে 'পারবেন' ভাবতে ভাল লাগে বৈকি!

দ্বিতীয় প্রশ্ন, সুনীলের একটা ট্রিপল-সেঞ্চুরি কি হবে না? তাঁর তিন-তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে, কিন্তু ট্রিপল নেই একটাও। বলা বাহুল্য, ভারতের কোনও ব্যাটসম্যানেরই নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের এই শূন্যতা দূর করার দায়িত্ব নেবার মতো ব্যক্তি সুনীল ছাড়া আর কেউ আছেন কি?

বাঙ্গালোর টেস্ট পর্যন্ত সুনীলের টেস্ট ব্যাটিং পরিসংখ্যান, এই—৭১টি টেস্টে ১২৮ ইনিংস (তার মধ্যে ৮টি অপরাজিত) খেলে সুনীল ২৪ টি সেঞ্চুরিসহ ৬,৪৫৯ রান করেছেন.। রানের গড় ৫৩·৮২৫। সর্বোচ্চ রান ২২১। মোট রানসংখ্যার দিক থেকে সোবার্স (৮,০৩২) বয়কট (বাঙ্গালোর টেস্ট পর্যন্ত ৭,৯৫১)। কাউড্রে (৭,৬২৪) ও স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের (৬, ৯৯৬) পরেই সুনীল। সোবার্সের মোট রানসংখ্যার রেকর্ডটি ভাঙতে বয়কটের দরকার মাত্র ৮২ রান। বেশি দেরি লাগবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ টেস্ট রানের রেকর্ডটি—৩৬৫ নট আউট সোবার্সের পকেটে আরও অনেকদিন থাকবে বলেই মনে হয়। কুড়ির বেশি টেস্ট সেঞ্চুরিওয়ালাদের মধ্যে সুনীল এদিক থেকে পিছিয়ে—সোবার্স ও সুনীলের মাঝে আছেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪) ও বয়কট(২৪৬ নট আউট)। আর রানের গড়ের কথাটা না-ই তুললাম। গড়ে স্যার ডনকে ইহজন্মে ছাড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়।

টিমে তালে দ্বিতীয় টেস্ট

শ্যামসুন্দর ঘোষ

বাঙ্গালোরে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্টের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গাভাসকারের ১৭২ রান। গাভাসকারের ব্যাটিং থেকে একসময় শত রান স্বাভাবিক মনে হলেও সাম্প্রতিক কালে কিন্তু ভারতীয় অধিনায়কের ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতারই চিত্র বিশেষ করে চোখে পড়েছে। বাঙ্গালোর টেস্টের আগে নটি টেস্টে গাভাসকারের পক্ষে সেঞ্চুরি করা তো দূরের কথা খেলার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাবই বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই একসময় গাভাসকারের পক্ষে ব্রাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙা সম্ভবপর বলে যাঁদের মনে হয়েছিল তাঁরাই কিন্তু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলেন গাভাসকারের ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে।

বাঙ্গালোরে গাভাসকার তাঁর ২৪তম টেস্ট সেঞ্চুরিটি করলেন। ২৪টি টেস্টের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে করেছেন দশটি। বাকি চোদ্দটির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি ও নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে দুটি। গাভাসকার. শুধু ১৭২ রানই করেননি, বলতে গেলে গোটা ভারতীয় দলের ইনিংসে একদিক একাই আগলে রেখেছিলেন। দুদিনের উপর উইকেটে টিকে থাকলেও গাভাসকারের ব্যাটিংয়ে চিত্তাকর্ষক মার দর্শকরা খুব কমই দেখতে পেয়েছেন। বস্তুত বাঙ্গালোর টেস্টে দুটি দল যে শম্বুকগতিতে রান তুলেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক খেলার মধ্যে পেশাদারি মনোভাবের প্রাধান্যই ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম দুদিন ব্যাট করে ইংল্যাণ্ড করেছিল ৪০০ রান। ভারত করল ৪২৮—দুদিনের উপর ব্যাট করে।

খেলোয়াড়দের খেলায় কোনো সময়ের জন্যে মনে হয়নি, খেলার যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁদের কথা তাঁরা ভাবেন। অর্থ ও সময় নষ্ট করে যাঁরা খেলার মাঠে হাজির হন তাঁরা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেন খেলোয়াড়দের ব্যাট থেকে কিছু দৃষ্টিনন্দন মার এবং বোলারদের বোলিং-চাতুর্যে ব্যাটসম্যানদের নাজেহাল হতে দেখা। ভারতে এক-একটা টেস্টের আসরে নয় নয় করেও সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অর্ধ কোটির উপর। আগে ক্রিকেট খেলা এত জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু খেলাকে ঘিরে অর্থের এত ঢালাও ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই শীতের দুপুরে ক্রিকেট খেলার আনন্দ পুরোপুরি পেতেই ক্রিকেট-অনুরাগী দর্শকরা মাঠে হাজির হতেন।

গাভাসকারের চেয়েও ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ফ্লেচারের আচরণ আরও বিস্ময়জনক। টসে জেতার যে একটা বাড়তি সুযোগ আছে তা ফ্লেচার বা ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের খেলায় প্রকাশ পায়নি। উইকেট যে খারাপ ছিল এইরকম অভিযোগ কেউই করেননি। আর ভাল উইকেটে ব্যাট করে দুদিনে মাত্র চারশো রান করে টেস্টে যে জেতা যায় না তা ফ্লেচারের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কাছে আদৌ অজানা নয়। আসলে ইংরেজরা রক্ষণশীল জাত। তাই খেলায় জেতার চেয়ে না-হারাটাই তাদের কাছে বড়। নাকি প্রথম টেস্টে হারের পর দ্বিতীয় টেস্টে জেতার চেয়ে কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়াই ফ্লেচারের উদ্দেশ্য ছিল?

কপিলদেব

ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

কলকাতায় ভারত-পাক হকি টেস্টের একটি উত্তেজনাময় মুহূর্ত ফোটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

পাক-ভারত হকি

অশোক রায়

মোহনবাগান মাঠের গ্যালারিতে বসে পাক-ভারত হকি-টেস্ট দেখতে দেখতে অনেকের মতো কষ্ট হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে, কালির আঁচড়ে বিভক্ত একটি দেশ আজ নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার জন্যে! খেলার মাঠে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হলে বোধহয় সেই কারণেই ম্যাচের রঙ বদলে যায়। খেলার মান যতটা না বাড়ে দু'দেশের মানুষের রক্তচাপ বাড়ে তার চেয়ে বেশি। অস্বীকার করার উপায় নেই সদ্যসমাপ্ত ভারত-পাক হকি টেস্ট সিরিজেও সেই 'টেনশান' ছিল একেবারে শুরু থেকেই।

দীর্ঘ তিন বছর পর দু'দেশের মধ্যে আবার হকি টেস্ট সিরিজ চালু হল। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ভারত এবং বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান তাদের নিজস্ব স্টাইল নিয়ে বোম্বাইয়ের উদ্বোধনী আসরে অবতীর্ণ হল। নিচু মানের আম্পায়ারিংয়ে ভারত হারল ৫-৩ গোলে। কিন্তু ভারতীয় হকির সাম্প্রতিক উন্নতির চিহ্ন ছিল তাদের খেলায়। পাকিস্তানের গোলে এইবারই প্রথম তিন বার বল ঢোকাল ভারত। মনে রাখার মতো হ্যাটট্রিক করলেন পাকিস্তানের হানিফ খান।

দ্বিতীয় টেস্ট নিয়ে কলকাতার মেতে ওঠার প্রধান কারণ ছিল অন্য। এর আগে পাক-ভারত হকি কখনও কলকাতার খেলা-পাগল মানুষ দেখেনি। হাস্যকর আম্পায়ারিং এবারেও আগ্রহী দর্শককে ভাল খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে কলকাতার দর্শকদের সান্ত্বনা, শর্টপাস এবং লং ক্লিয়ারেন্সের ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ কাজে লাগিয়ে ভারত ৪-৩ গোলের ব্যবধানে ম্যাচ মুঠোয় পুরেছে। শাহিদ ভারতের পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ফীল্ড গোলটি করলেও কলকাতাকে মুগ্ধ করেছে নেগির অসাধারণ

গোলকীপিং। পাকিস্তানের কলিমুল্লার মতো দক্ষ খেলোয়াড়ের দুটি পেনাল্টি স্ট্রোক আটকাবার পর মোহনবাগান মাঠে জমাটি তর্ক উঠেছিল পেনাল্টি রোখায় কে বড়, শিবাজি ব্যানার্জি না নেগি?

ভারতের মাটিতে ফলাফল ১-১ হওয়ায় লাহোরে তৃতীয় টেস্টে ভারত কিছুটা স্বস্তি নিয়েই নেমেছিল। কিন্তু বিরতির সময়ে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ভারতকে প্রচণ্ডভাবে চেপে পাকিস্তান পরপর দু-দুটো গোল দিয়ে ম্যাচ ধরে নিল। শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হবার ছ'মিনিট আগে রাইট ব্যাক রাজিন্দারের গোলে ভারত ফলাফল ২-২ করে পাকিস্তানের থাবা থেকে মুক্তি পায়। নিরপেক্ষতার প্রশ্নে পাকিস্তানের মাটিতে খেলা পরিচালনা করলেন হল্যাণ্ডের আম্পায়াররা।

ফলাফল এক বিন্দুতে আটকে থাকায় পাকিস্তান যে ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ মিলল করাচির চতুর্থ এবং শেষ টেস্টে। অনভ্যস্ত ভারতকে অ্যাস্ট্রোটার্ফে নাজেহাল করে একসময় পাকিস্তান ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। ভারত লড়াই করে ম্যাচে ফেরে রাজিন্দার সিং এবং কৌশিকের গোলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আরেকটি গোল দিয়ে ফলাফল ৪-২ করে সিরিজ জিতল পাকিস্তান। ভারত তিন-তিনটি পেনাল্টি স্ট্রোকের অপচয় না ঘটালে খেলার রেজাল্ট অন্যরকম হতে পারত।

এ-পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান পরস্পরের মুখোমুখি হল ২৬ বার। ১৫টি জয়ে পাকিস্তান গোল করেছে মোট ৫২টি। যার মধ্যে রয়েছে ১৯৮০ সালের চ্যাম্পিয়নস কাপে ৭-১ গোলে ভারতকে চূর্ণ করার রেকর্ডটি। ভারত জিতেছে সাতবার। এবারের কলকাতা টেস্টে ৪-৩ গোলে জেতার নজিরটি ভারতের পক্ষে সব-সেরা দৃষ্টান্ত। ভারতের দেওয়া গোলের সংখ্যা ২৫।

অলিম্পিকে দু'দেশের দেখা হয়েছে চারবার। দুটি করে জয় ভাগ করে নিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এশিয়ান গেমসে সাতবারের সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের জয় এসেছে চারটিতে। ভারত জিতেছে মাত্র একবার। বিশ্বকাপে তিনবার মোলাকাতে ভারত জিতেছে দুবার, পাকিস্তান একবার।

ভারতের অধিনায়ক সুরজিৎ সিং

পাকিস্তানের অধিনায়ক আখতার রসুল

সুবর্ণ-স্বাদের বিস্কিট!
DELICIOUS Dalimia ORANGE CREAM BISCUITS
COCONUT COOKIES
Dalimia
Dalimia GLUCOSE
নতুন
ডালিমা
বিস্কিট
এসেছে আপনার জন্য।
ডালিমা বিস্কিট উৎকৃষ্টতার জন্য বছরের পর বছর বহু আন্তর্জাতিক সোনার মেডেল জিতেছে।
'লে মণ্ড' (বিশ্ব) সিলেক্সন সোনার মেডেল জিতেছে :
১৯৭৭ সালে ব্রুসেলসে
১৯৭৮ সালে জেনেভায়
১৯৭৯ সালে প্যারিসে
১৯৮০ সালে ভিয়েনায়
১৯৮১ সালে এ্যামস্টারডমে
ডালিমা বিস্কিটের জুড়ি নেই
সুবর্ণ-স্বাদের ডালিমা বিস্কিট তুলনাহীন।
স্বাদে ভরা খাস্তা কোকোনাট কুকিস–যত খাবে তত মজা। মজাদার পুষ্টিকর গ্লুকোজ বিস্কিট–এ'তে সবচেয়ে বেশী পরিমানে গ্লুকোজ আছে। সোনার মেডেল পাওয়া এ'টাই একমাত্র গ্লুকোজ বিস্কিট।
ডালিমার ক্রীম বিস্কিট চমৎকার নতুন স্বাদে ভরা–অরেঞ্জ ক্রীম, পাইনএ্যাপেল ক্রীম, বাটার ক্রীম। স্বাদে ও গন্ধে তাজা। এ'ছাড়া আছে আরো নানা রকমের স্বাদের বিস্কিট – নোনতা এবং ক্র্যাকার্স।
পাঞ্জাবের সোনা-রংয়ের উৎকৃষ্ট গম দিয়ে তৈরী হয় এই বিস্কিট।
এই বিস্কিটের তাজা স্বাদের জন্য সবসময় পাঞ্জাবের পুষ্টিকর এবং সবচেয়ে সেরাজাতের সোনা-রংয়ের গমই ব্যবহার করা হয়।
ডালিমার কারখানাগুলি পাঞ্জাবেই অবস্থিত।
উত্তর ভারতে ৪০-এর ও বেশী বছরের পরিচিত ও জনপ্রিয় এই ডালিমা বিস্কিট আজ এসেছে আপনার জন্য।
MONDE SELECTION BRUXELLES SELECTION DE LA QUALITE
উৎকৃষ্ট বিস্কিটের নির্মাতা
ডালমিয়া বিস্কিট প্রাইভেট লিমিটেড
HTD-DBL-7030

জীরোর হীরো

প্রিয়দর্শী

যে-কোনো ব্যাটসম্যানের কাছেই 'শূন্য' রানে আউট হওয়াটা সবচেয়ে দুঃখের। মানতেই হবে, একটা সেঞ্চুরি যতটা প্রশংসা ছড়ায়, একটা শূন্য ঠিক ততটাই নিন্দের পথ তৈরি করে। তাই ইনিংসের শুরুতে সব ব্যাটসম্যানের বুকেই জমা থাকে শূন্যের ঘর অতিক্রম করার ধুকপুকে বাসনাটি। কিন্তু যেহেতু খেলাটা ক্রিকেট এবং অনিশ্চিত, তাই সব ব্যাটসম্যানের পক্ষে শূন্যের গাঁট পার হওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। আশ্চর্য, এই শূন্যর ফাঁদে আটকা পড়েছেন এমন বহু কৃতী ব্যাটসম্যান, যাঁদের নামের সঙ্গে শ্রদ্ধা, বিস্ময় প্রভৃতি শব্দগুলো গভীরভাবে যুক্ত।

আমরা জানি, ভিক্টর ট্রাম্পার, ওয়ালি হ্যামণ্ড, লেন হাটন, ডন কেনিয়ান, লেস্‌লি এম্‌সের ব্যাট বিভিন্ন সময়ে রানের ফুলঝুরি জ্বেলেছে। অথচ, আমরা অনেকেই জানি না, একটা সময় (প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে) উপর্যুপরি তিন ইনিংসে তাঁদের ব্যাট উপবাসী থেকেছে কোনো রান সংগ্রহ না করে! এর মধ্যে এম্‌স তিনবারই আউট—প্রথম বলে!

প্রথম বলে আউট হবার কথায় মনে পড়ল আরও কিছু স্বপ্নের ক্রিকেটারের কথা। ডব্লু জি· গ্রেস, হ্যামণ্ড, উলি, হাটন, জার্ডিন, ডেক্সটার, কনস্টানটাইন, উইকস, ক্রেম হিল, নর্মান ও'নীল প্রভৃতি বেশ কিছু নাম যথেষ্ট শ্রদ্ধা জাগানো সত্ত্বেও ওঁরা প্রথম বলেই আউট হবার দুর্ভাগ্য থেকে সর্বদা মুক্ত হতে পারেননি। ক্রিকেট দেয়, আবার কেড়েও নেয়। ক্রিকেটের এই বিচিত্র খামখেয়ালিপনার উদাহরণ—ইংল্যাণ্ডের ডেনিস কম্পটন। ১৯৪৬ সালে পরপর ছ'টি ইনিংসে কম্পটনের সংগ্রহে ছিল চারটি শূন্য (অন্য দুটিতে ১, ৮)। সমালোচকদের বাঁকা কথা, পত্র-পত্রিকায় বিস্তর অপ্রিয় মন্তব্য কম্পটনকে ভাবাল এবং বাধ্য করল পরের মরশুমে জ্বলে উঠতে। এর পরের ঘটনা এক ইতিহাস। ১৯৪৭ সীজনে ১৮টি সেঞ্চুরি এবং ৩৮১৬ রানের দুটি অলৌকিক রেকর্ড দিয়ে নিজেই মুছলেন অপমানিত ইতিহাসের কলঙ্ক-কাহিনী।

ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজেও শূন্যের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। দু দেশের মোট আউট-হওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শতকরা ১২ জন আউট হয়েছেন শূন্যতে।

এবার দেখি 'শূন্য'র ফাঁপা অস্তিত্ব নিয়ে কারা ওপর দিকে ভাসছেন। 'শূন্যর সম্রাট' নিঃসন্দেহে ভারতের বিস্ময়-বোলার চন্দ্রশেখর। ২৪২টি উইকেট-পাওয়া এই বোলারের জমার ঘরে রয়েছে ২৪টি শূন্য। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে 'চন্দ্র'র সগোত্র যাঁকে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি নর্দাম্পটনের জে· সি· শ'। জীবনের ১০৯টি ইনিংসের মধ্যে তিনি নিতান্ত ভুল করে কিংবা রেকর্ড গড়ার তাগিদেই মাত্র একবার দু' অঙ্কের রানে পৌঁছে যান! অবশ্য ইয়র্কশায়ারের জি ডেইজকেই বা বাদ দেওয়া যাবে কী করে! পরপর ১৪টি ইনিংসে তাঁর সংগ্রহে ১১টি শূন্যের মালা (দুটি নট আউটসহ)। নিউজিল্যাণ্ডের আর· ডব্লু· ব্লেয়ার ৩৪টি টেস্ট ইনিংসে ১২টি শূন্য হজম করে শূন্যর গড়-তালিকার ওপর দিকে স্থান করে নিয়েছেন। শূন্য-সংগ্রহকারীদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার এ রাইটের নামটি থাকবেই, কারণ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে উপর্যুপরি ছ'টি ইনিংসে জীরো বানিয়ে 'হীরো' হয়েছেন একমাত্র তিনিই।

কিছু সময় শূন্য খুব ছোঁয়াচে। ১৮৭২ সালে সারের বিপক্ষে গোটা এম· সি· সি· অল আউট হয়ে গেল মাত্র ১৬ রানে। এর মধ্যে প্রথম সাত ব্যাটসম্যান ছোঁয়াচে শূন্যর শিকার। ১৮৯১ সালে ইয়র্কশায়ার এবং মিডলসেক্স দলের খেলাটি মনে রাখার একমাত্র কারণ সবসমেত ১৮ জন ব্যাটসম্যান 'শূন্যর শোকযাত্রা'য় অংশ নিয়ে একটি অভাবনীয় বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ১৯৮০-র ডিসেম্বরে করাচি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে পাকিস্তানের ছ'জন ব্যাটসম্যান আউট হন শূন্য রানে। একটি টেস্ট ইনিংসে শূন্যর এমন মড়ক আগে কখনও লাগেনি।

সবশেষে বলতেই হবে—'সব শূন্যই হেলাফেলার নয়।' ১৯৪৬ সালে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে এম· সি· সি-র জে ইয়াং এবং আর· ডব্লু· ভি· রবিন্স ৭৫ রান যোগ করেছিলেন। রবিন্স একাই ৭৫ রান করলেও ইয়াং-এর অপরাজিত শূন্য তাঁকে দারুণ সাপোর্ট দিয়েছিল সেদিন।

মেজদা ও বুলফাইট

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

হাতিবাগানের মেজদার কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার হিড়িকে যে-ক'টি পরিবার কলকাতা ছেড়ে আমাদের এই আধা-শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের একটা সহজ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

মেজদা তাদেরই একজন। আমাদের আধা-শহরে আসার পর মেজদা অচিরেই আমাদের দলপতির আসনটি দখল করে নেয়। মেজদাকে আমরা সমীহ করতাম, কারণ মেজদা ছিল কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে চোস্ত শহুরে। ওর সুবাদে না-দেখা কলকাতা শহরের মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা সব আমাদের চোখের সামনে ভাসত।

মেজদার বোধহয় কলকাতার জন্য মন কেমন করত। সেইজন্যে আমাদের আধা-শহরটাকে কটাক্ষ করে মাঝে-মাঝে আলটপকা এমন সব কথা বলত, যা আমাদের পছন্দ ছিল না। মেজদা নাকাল হলে এই কারণেই আমরা বেশ মজা পেতাম।

ছুটির দিনে আমাদের আড্ডার প্রধান জায়গা ছিল চৌধুরিদের পাঁচিল-ঘেরা বিরাট চৌহদ্দির আম-বাগানটা। তার এক কোণে ছিল বুড়ো মালির ঘর, আর এক কোণে একটা বড়সড় ডোবা। সেটা সব সময় সবুজ পানায় ভরে থাকার জন্য মাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে থাকত। না জানা থাকলে ওটার অস্তিত্ব বোঝাই যেত না। ওটাকে সবাই বলত চৌধুরিদের গড়।

একদিন শীতের দুপুরে চৌধুরিদের সেই আমবাগানে বসে আমরা গল্প করছিলাম।

মেজদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বুলফাইট কাকে বলে জানিস?"

আমাদের জব্দ করবার জন্য মেজদা মাঝে-মাঝে এমনি উটকো প্রশ্ন করত।

বুলফাইট কাকে বলে, তা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু বলার উপায় ছিল না। কারণ, আমরা

যদি বলি বুলফাইট মানে ষাঁড়ের লড়াই, তাহলে আমাদের উত্তরটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মেজদা নির্ঘাত বলবে, কিচ্ছু জানিস না, কক্ষকম্ব কোথাকার, বুলফাইট মানে লড়াইয়ের ষাঁড়।

অতএব চুপচাপ থাকাই সমীচীন। মেজদা আবার শুধোল, "বুল রিং মানে কী?"

আমরা নিরুত্তর।

মেজদা আবার প্রশ্ন করল, "মাটাডোর কার নাম? রেড র‍্যাগই বা কী জিনিস?"

আমরা নির্বাক।

আমাদের অজ্ঞতাকে করুণা করে মেজদা বলল এবার, "কিছুই জানিস না। তোরা এক-একটি কক্ষকম্ব।"

বিল্টু মুখ গোঁজ করে বসে রইল। মেজদা বলল, "বুলফাইট মানে ষাঁড়ের লড়াই।"

আমি বোকা-বোকা মুখ করে বললাম, "ষাঁড়ের সঙ্গে ষাঁড়ের?"

মেজদা বলল, "না, ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের। তা বলে ধর্মের ষাঁড় নয় তোমার মতো। রীতিমত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বিলিতি ষাঁড়, বুঝলে। বুল রিং মানে রণাঙ্গন, আর রেড র‍্যাগ মানে ষাঁড়কে খেপিয়ে তোলার লাল রঙের কম্বল। মাটাডোর মানে হল ফাইটার। কল্পনা করতে পারিস, একটা বিশাল ময়দান, এত বড় যে তার মধ্যে তোদের এই এঁদো গ্রামের মতো দু-পাঁচটা গ্রাম সেঁধিয়ে যায়। চারপাশে অজস্র লোক। আর সেই ময়দানের মধ্যে..."

বিল্টুর কথাবার্তায় মাঝে-মাঝেই হিন্দি শব্দ ঢুকে যায়। সে ফুট কাটল, "বুলফাইট তো স্পেনে হয়। তুমি কভি স্পেন দেশে গেসলে মেজদা?"

"আবার?" মেজদা ঝাঁঝিয়ে উঠল, "কথার মধ্যে বাগড়া দিচ্ছিস? এমন জুজুতসুর প্যাঁচ ঝাড়ব এখুনি।"

জুজুতসুর ভয়ে জুজু হয়ে যায় বিল্টু। পুরনো কথার খেই ধরে আবার শুরু করল মেজদা, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ময়দানের চারপাশে হাজার-হাজার দর্শক। তার মধ্যে জমকালো পোশাক পরা কয়েকজন যোদ্ধা। এক হাতে ছুরি, আরেক হাতে রেড র‍্যাগ, আর কোমরে ঝোলানো লম্বা একখানা ফেন্‌সিং শোর্ড। টিনের তলোয়ার নয়, বুঝলি? শক্ত লিকলিকে ইস্পাতের ফলা। তারপর শুরু হবে লড়াই। এসব বানানো গল্প নয়। যাকে বলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।"

"ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা?" আমার মুখ ফশকে আর-একটি নির্বোধ প্রশ্ন বেরিয়ে আসে।

মেজদা খেঁকিয়ে উঠল, "আবার ফুট

কাটছিস? সেজো কাকিমার বোনের ভাসুরপো সুবীরের নিজের চোখে দেখা। তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল না? সে-লোকটা তো একটা ব্যক্তি, নাকি ব্যক্তি নয়?"

এ রকম অভিনব ব্যাখ্যায় আমরা পুলকিত। "সহি বাত।" বিল্টু বলল। ওর কথায় কান না দিয়ে আবার শুরু করল মেজদা, "দর্শকদের চোখে পলক নেই। মুখে কথা নেই। একেবারে স্পীকটি নট। লড়াই শুরু হল। রোমহর্ষক ব্যাপার। হাতে রেড র‍্যাগ নিয়ে মাটাডোর তো খেপাতে লাগল ষাঁড়টাকে। ষাঁড়টা ফুঁসতে ফুঁসতে তেড়ে যায় মাটাডোরের দিকে। মাটাডোর চলে যায় নাগালের বাইরে। আবার রেড র‍্যাগ নিয়ে এগিয়ে যায় ষাঁড়টার দিকে। ষাঁড়টা তেড়ে যায় আবার। মাটাডোর অমনি ডিগবাজি দিয়ে পালায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এমনি প্যাঁচের লড়াই। তার পর আসে চরম মুহূর্ত, যাকে বলে ক্লাইম্যাক্স। তখন, কখনো ষাঁড়টা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে মাটাডোরকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, কখনো মাটাডোর ষাঁড়টার শিং দুটো ধরে শূন্যে তুলে আছাড় দেয়, তারপর কখনো ষাঁড়টা মাটাডোরের ওপর, কখনো মাটাডোর ষাঁড়টার ওপর, কখনো ষাঁড়টা মাটাডোরের ওপর, কখনও মাটাডোর ষাঁড়টার ওপর..."

আমার কেমন যেন ঘোর-ঘোর লাগছিল। এক জায়গায় পিন আটকে বাজতে থাকা গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো আমার কানে বাজছিল, ষাঁড়-মাটাডোর, মাটাডোর-ষাঁড়। আমি অস্থির বোধ করছিলাম।

আচ্ছন্নের মতো আমি চিৎকার করে বললাম, "ইশ, শেষ করো কথাটা, আমার রগ দুটো টিপ-টিপ করছে।"

আমার চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে কথাটা শেষ করল মেজদা। "এইভাবে মাটাডোর ষাঁড়টাকে ক্ষতবিক্ষত করে মেরে ফেলে। মানে শোর্ডটা ষাঁড়টার কুঁজে আমূল বিঁধিয়ে দেয়।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, "অথবা ষাঁড়টাই মেরে ফেলে মাটাডোরকে।"

বিল্টু বলল, "যা ব্বাবা, শুনে দম বন্ধ হয়ে গেসল।"

মেজদা বলল, "হ্যাঁ, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ারই কথা। তোদের এই পোড়া দেশে না আছে কোনো রোমাঞ্চ, না কোনো থ্রিল। ভাবছি ওদেশে জন্মালেই ভাল ছিল।"

মেজদা এমন ভাবে কথাটা বলল যেন যে-কোনো দেশে জন্মানোটা ওর ইচ্ছাধীন।

ঠিক সেই সময় পাঁচিলের ধারে কী যেন দেখে আঁতকে উঠল বিল্টু। "ওই দ্যাখো মেজদা!"

"কী?"

"থ্রিল।"

আমি আর মেজদা একসঙ্গে পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চৌধুরিদের বিরাট রামছাগলটা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে।

ওর একরোখা ভঙ্গি দেখে আমি লাফিয়ে উঠলাম, "আরে বাবা, এ যে তেড়ে আসে!"

বিল্টু বলল, "আবার কামড়ায়ও।"

"তাই নাকি?" মেজদা অসহায়ের মতো আমাদের দিকে তাকাল। ছাগলটা তখন আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

আমি আর বিল্টু ঝট করে কাছের বড় আমগাছটার ডালে চড়ে বসলাম। বিল্টু চেঁচিয়ে বলল, "মেজদা, ওই বড়কা পেড়টার ডালে চড়ে বোসো, নইলে বকরাটা তোমার পিলে ফাটিয়ে দেবে।"

ছাগল আর মেজদা তখন মুখোমুখি।

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন–

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ভাস্কর জাঙিয়া
৪। ফ্রেন্দার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। ফুলস্কিন গেঞ্জী

RAJU

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

দুজনেই দুজনের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে, কুস্তির আগে পাঁয়তারা কষার ভঙ্গিতে। তারপর ছাগলটা ডান পা তুলে মাটির ওপর ঠুকতে লাগল, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান জানানোর মতো। তারপর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে দেখলাম মেজদা ছুটছে। পিছু-পিছু শিং উঁচিয়ে ছুটছে রামছাগলটাও।

মেজদা সমানে চেঁচাচ্ছে, "গেলাম, গেলাম!"

ডালের ওপর থেকেই বিল্টু চেঁচিয়ে বলল, "অমন ষাঁড়ের মতন চেল্লাচ্ছ কেন মেজদা? বকরাটা তোমাকে একটা থ্রিলের মওকা দিচ্ছে, আর তুমি কিনা..."

"তুমি বরং ছাগলটার ওপরই একটা জুজুতসুর প্যাঁচ কষে দাও মেজদা," আমি বললাম, "দেখবে ছাগলটা ইঁদুরের মতো পালাচ্ছে।"

"কিংবা এক কাজ করো।" ওপর থেকেই উপদেশ ছুঁড়ে দেয় বিল্টু, "তোমার লাল সোয়েটারটাকে রেড র‍্যাগ করে ওর সামনে দেখাও। বুলফাইট না হোক, একটা গোট-ফাইট হতে পারে।"

মেজদা ছুটতে-ছুটতেই বলল, "অমন বিশ্রী রসিকতা করিসনে বিল্টু, একটা প্র্যাকটিক্যাল কিছু বল, যাতে রেহাই পাই।"

মেজদা এবার ঘামছে। সমস্ত বাগানটা ঘিরে প্রথম চক্কর শেষ করে এটা ওর দ্বিতীয় চক্কর।

"তুমি সমস্ত মাঠটা জুড়ে চক্কর দাও মেজদা," আমি বললাম, "চরকির মতো।"

বিল্টু বলল, "হ্যাঁ, গোল হয়ে, সোজাসুজি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি, হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের জিওমেট্রি ফলো করে। শেষে দেখবে ক্লান্ত হয়ে ছাগলটা সরে পড়েছে।"

তৃতীয় চক্কর সমাপ্ত করে হাঁপাতে-হাঁপাতে মেজদা বলল, "কিন্তু তার আগে আমিই যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ি?"

"তুমি ক্লান্ত হোয়ো না মেজদা," আমি বলি, "না না, কিছুতেই না।"

"আর যদি ছাগলটাও ক্লান্ত না হয়?"

"তাহলে ছাগলটাও তোমার পিছনে ঘুরতে থাকবে।" বিল্টু বলল, "চিরকাল ঘুরবে। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে ঘোরে।"

মেজদা এবার সত্যিই ক্লান্ত। মাঠ ছেড়ে মেজদা এবার একটা মোটা আমগাছের গুঁড়ি ঘিরে ঘুরছে। যেন ছাগলটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বিল্টু বলল, "মেজদা, গাছটার চারপাশে অমন করে ঘুরো না। অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন খালি-খালি ঘুরতে ইচ্ছে করবে।"

"এমনকী, ছাগলটা না থাকলেও।" আমি বলি।

মেজদা আর কথা বলছে না। ঘাড় হেঁট করে নীরবে ঘুরছে। যেন নিবিষ্ট মনে কর্তব্য পালন করছে।

বিল্টু বলল, "তার চেয়ে এক কাজ করো মেজদা, তুমি গাছের গুঁড়ির মতোই দাঁড়িয়ে যাও। ছাগলটা তোমাকে দু' চারবার গুঁতিয়ে গাছ ভেবে সরে পড়বে।"

"কিন্তু যদি ওর গুঁতোনোর চোটে আমি সাবাড় হয়ে যাই?" মেজদা মিনমিন করে বলল।

"বিল্টু বলল, "ওটা রিস্ক।"

"নো রিস্ক নো গেইন," আমি সায় দিলাম। মেজদার দৌড়ানোর গতি এদিকে ক্রমশ কমে আসছে।

"বিল্টু রে, আর পারছি না।" মেজদা এবার কোনাকুনি দৌড়চ্ছে। এরপর বোধহয় লম্বালম্বি, তারপর সোজাসুজি। জ্যামিতির উপপাদ্য-সম্পাদ্য অনুসারেই।

তারপরেই হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম—ঝপাং।

বিল্টু বলল, "বোধহয় মাটাডোরের পতন হল এবার।"

মেজদা বাগানের কোণের পানাপুকুরে আশ্রয় নিয়েছে এবার। এখন অবশ্যই ছাগলটার নাগালের বাইরে।

খানিকক্ষণ পর। মেজদার শার্ট প্যান্ট ভিজে চুপসে গেছে। সারা গায়ে-মাথায় পানাপুকুরের জঞ্জাল। ঠকঠক করে কাঁপছে মেজদা।

বিল্টু বলল, "তোমার কষ্ট হয়েছে মেজদা, লেকিন গোট-ফাইটটা বড়ি থ্রিলিং হয়েছিল।"

মেজদা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "চুপ কর, কক্ষকম্ব কোথাকার।" তারপর আমাকে বলল, "ভারী শীত করছে, এককাপ চা খাওয়াতে পারিস রে ঘণ্টা?"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া-ভূত

সাধনা মুখোপাধ্যায়

রাত্তিরে কড়া নাড়ে
কে রে জোর-জোর ?
খুলিসনে খুলিসনে
খুলিসনে দোর !

খটাখট খটখট
ভূত হাঁটে গটগট,
ঘাড় ভেঙে দেবে মট—
মরবি বেঘোর।

রাত্তিরে কড়া নাড়ে
কে রে জোর-জোর ?
হয়তো সে হতে পারে
ডাকাত বা চোর !

চাদরটা দিয়ে মুড়ি
হাঁটছিস মেরে গুঁড়ি
দরোজাটা খুলবি কি ?
কী সাহস তোর !

পেত্নির ছানাগুলো
স্বভাবে বড্ড বুনো,
যেন নিশি জাগবার
জানে মন্তর।

বাড়াবে লম্বা হাত,
কোনোদিকে দৃকপাত
না করেই খুলে দেবে
মুগুর জোড়।

ক্রমাগত ঝটপট
ভূত হাঁটে গটগট,
কী দারুণ খটখট
আছড়ায় দোর !

তবু তুই শুনলি না ?
এক-দুই গুনলি না ?
দরোজাটা খুলে দিলি ?
ওমা এ যে ভোর !
হাওয়াই ধাক্কা দিয়ে
সাজে ভূত চোর।

ছবি অহিভূষণ মালিক

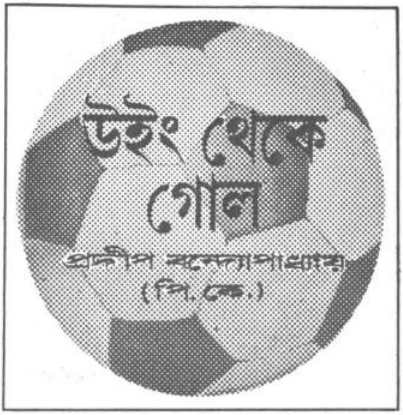

॥ ৩৭ ॥

উনিশশো আটান্নর সন্তোষ ট্রফির চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা হল মাদ্রাজে, উনষাটের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। সেখানেও আমাদের কোচ হয়ে গেলেন অরুণ সিন্‌হা।

আমাদের টীম দারুণ। একবার ভাবো সর্বভারতীয় দলের ছয়জন খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে বসে থাকতে হচ্ছিল। প্রথম খেলায় মাদ্রাজকে আমরা সহজেই হারালাম ৪-০ গোলে। আমার আর চুনীর পাস থেকে দামোদরন দুটি গোল করার পর, আমি আর চুনীও গোল করলাম। দুর্দান্ত খেললেন দুই সাইড হাফ কেম্পিয়া আর রামবাহাদুর।

দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লিকে ৩-১ গোলে হারালাম। এ-দিনও দামোদরণ দুটি গোল করলেন। গ্রুপের শেষ ম্যাচ হায়দরাবাদের সঙ্গে। সকালে ভারালু বললেন, "ওয়ালটেয়ার থেকে আমার পরিচিত এক জ্যোতিষী চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, আজকের দিনটা বাংলার পক্ষে খুবই খারাপ।" কোচ ডুডুদা বললেন, "খারাপ দিনটা বেছে বেছে হায়দরাবাদের দিনই পড়ল। কুসংস্কার ছাড়ো, আজ জিততেই হবে।"

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল। খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে পর্যন্ত কেউ গোল করতে পারেনি। হঠাৎ সুশীল গুহ আর সালামের ভুল বোঝাবুঝিতে হায়দরাবাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন বল পেয়ে গেলেন। আমাদের গোলকীপার রবীন (নাণ্টা) গুহ সামান্য এগিয়ে এসেছিলেন। চমৎকার প্লেস করে নেটে বল গড়িয়ে দিলেন কানন। শেষ তিন মিনিট অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল শোধ করা গেল না।

গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায়, সেমিফাইনালে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল অন্য গ্রুপের চ্যামপিয়ন বোম্বাই। বলরামের গোলে আমরা এগিয়ে গেলেও, গোল শোধ করে দিলেন বোম্বাইয়ের জাফর। বোম্বাইয়ের কোচ সেবার স্বনামধন্য রহিমসাহেব। স্বভাবতই ওরা সুসংবদ্ধ ফুটবল খেলেছিল। রিপ্লে ম্যাচেও আমরা এগিয়ে গেলাম দামোদরনের গোলে। বালান সেই গোল শোধ করার পর আবার বাংলাকে এগিয়ে দিলেন চুনী গোস্বামী। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার কয়েক সেকেণ্ড আগে বোম্বাইয়ের দেবদাস ২-২ করে দিলেন।

তবে, তৃতীয় দিন আমরা ২—১ গোলে জিতলাম। খেলার পর রহিমসাহেব বললেন, "বাংলার এই টীমকে বোম্বাই তিন দিন খেলতে বাধ্য করল, এটাই যথেষ্ট।"

অন্যদিকের সেমিফাইনালে বিরাট অঘটন ঘটল। আগের বছরের চ্যামপিয়ন শক্তিশালী হায়দরাবাদকে সার্ভিসেস হারাল পাঁচ গোলে। আজিজ-লতিফ-নূর-প্যাট্রিকেরা যে ফুরিয়ে যাচ্ছেন, বোঝা গেল। এবং এই ম্যাচেই দারুণভাবে আলোড়ন জাগালেন এক বাঙালি ইনসাইড ফরোয়ার্ড—মলয় লাহিড়ী। তিনি শুধু হ্যাটট্রিকই করলেন না, হায়দরাবাদ রক্ষণভাগকে তছনছ করে দিলেন।

ফাইনালে সার্ভিসেস বাংলাকে হারিয়ে দেবে, এমন আশা অনেকেই করলেন। কিন্তু সুশীল গুহ আর আমেদ হোসেন লাহিড়ীকে কিছুই করার সুযোগ দিলেন না। অধিনায়ক রবীন গুহও গোলের নীচে দুর্ভেদ্য ছিলেন।

দামোদরন চমৎকারভাবে এগিয়ে বল বাড়িয়েছিলেন বলরামের দিকে। পেনালটি বক্সের ওপর থেকে প্রচণ্ড শট নিলেন বলরাম। সার্ভিসেসের গোলকীপার থঙ্গরাজের আর কিছুই করার ছিল না সেই বল জাল থেকে ছাড়িয়ে আনা ছাড়া।

গোলের সহজতম সুযোগ আমিই নষ্ট করলাম। আমি বলরামের পায়ে বল দিতেই, বলরাম থঙ্গরাজের মাথার ওপর দিয়ে নিখুঁত 'চিপ' করলেন। সামনে ফাঁকা গোল। ভলি করব না প্লেস করব, দোটানায় পড়ে গেলাম। সেক্ষেত্রে যা হয়, তাই হল। বল বারের ওপর

সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল শুরু হবার আগে পি. কে.র সঙ্গে করমর্দন করছেন মাদ্রাজের (এখন 'তামিলনাড়ু) রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধি। পাশেই কেষ্ট পাল।

দিয়ে উড়ে গেল। আমার ধারণা, জীবনে যত গোলের সুযোগ নষ্ট করেছি, তার মধ্যে এটিই সহজতম। বলরাম বলটা প্লেটের ওপর সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

উনিশশো উনষাটের মরসুমে ঢোকার আগে বার্মা সফরের আরও কিছু কথা তোমাদের বলে নিই, যা আগে বলা হয়নি।

রেঙ্গুনে প্রথম এবং দ্বিতীয় ম্যাচের মধ্যে দু'দিন সময় ছিল। 'থাই-হ্যামস্ট্রিং ক্র্যাম্প' থাকায় দ্বিতীয় ম্যাচে আমার পক্ষে খেলা সম্ভব ছিল না। কোচ বলাই চ্যাটার্জি বললেন, "তুই শুয়ে পড়।" ভাবলাম, ম্যাসাজ হবে। শোয়ার পর, টেবিলের দুই ধারে সুশীল গুহ আর পদ্ম মিত্র দাঁড়ালেন। তারপর বলাইদা, আমেদ হোসেনকেও ডেকে বললেন, "তোরা তিনজন এর হাত-পা ভাল করে চেপে ধর।"

সে কী, ইনজেকশন দেবে নাকি? সেজন্য হাত-পা চেপে ধরার কী দরকার? বলাইদা বেশি সুযোগ দিলেন না। একটা গরম ইস্ত্রি উরুর ওপর চেপে ধরলেন। মাঝে খুব একটা পাতলা কাপড়। আমি 'বাবা রে মা রে' বলে আর্তনাদ করলেও কিছু করতে পারলাম না। তিনজন 'পালোয়ান' একসঙ্গে চেপে ধরলে কেউ নড়তে পারে!

যখন ছাড়া হল, তখন চামড়া পুড়ে গেছে। আমার চোখে জল। বলাইদা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখে নিস, সব সেরে যাবে।"

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল ডান পা যেন একটু উঠে রয়েছে। নিখিলদা এসে দেখে বললেন, "সর্বনাশ! এ যে বিরাট ফোসকা পড়েছে।"

শুনে মাথা গরম হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এমন সর্বনাশ-কাণ্ড করলে মাথা ঠিক থাকে? দৌড়ে বলাইদার ঘরে গিয়ে বললাম, "আমার পায়ের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।"

বলাইদা বললেন, "ও কিছু না। ফোসকা সেরে যাবে। কিন্তু এখন তুই এ ঘরে দৌড়ে এলি কী করে? কালকে তো পারছিলি না!"

আবার দৌড়ে দেখি, তাই তো! বিকেলে একটা গোলও করলাম। তবে, স্বীকার করছি, এই ওষুধ আমি পরে কখনও নিজের ওপর বা অন্য কোনো ফুটবলারের ওপর প্রয়োগ করিনি।

এই ম্যাচেই একটা আশ্চর্য গোল করেছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড কেষ্ট পাল। ডান দিক দিয়ে লেফট ব্যাককে কাটিয়ে তীরবেগে এগোলাম। কিন্তু কেষ্টদা তখনও অনেক পিছনে। চেঁচিয়ে বললেন, "একটু থেমে প্রদীপ।"

গোলকীপারের দিক থেকে বাঁক নিয়ে উঁচু সেন্টার কেষ্টদার দিকেই এল। কিন্তু বল যখন পড়ছে, কেষ্টদা তখনও অন্তত আট-দশ ফুট দূরে। গোল হওয়া অসম্ভব। তারপর যা দেখলাম, তা শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে শূন্যে নিজের শরীর ভাসিয়ে মাটি থেকে তা ফুট-দেড়েক ওপরে বলে মাথা লাগালেন কেষ্ট পাল। বারো গজ দূর থেকে ঐ অবস্থায় করা হেডটিতেও এমন জোর এবং নির্ভুল নিশানা ছিল যে গোলকীপার কিছুই করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে বললাম, "কেষ্টদা, কী গোল করলে!"

বাড়িয়ে বলছি না, এই গোল ডি স্টিফানো বা পুসকাস করলে পৃথিবীর ফুটবল-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত! (ক্রমশ)

আগে যা ঘটেছে: শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবরে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি কোনও ওষুধ মেশাত তার খাবারে? ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রাম-ফর্মের খোঁজ মেলে। সান্যালের বাসে উঠে সিংহিবাবু জখম। তিনি জানান, সান্যাল শিশিরদেরই প্রতিশোধলিপ্সু আত্মীয়; তারই কথায় তিনি শিশিরকে পাগল করবার চেষ্টা করেছিলেন। চক্রান্ত ফাঁস হবার ভয়ে সান্যাল কি সিংহিবাবুকে খুন করতে চায়? শিশিরের বন্ধু বংশী বলে, লছুয়াকে সিংহিবাবুর বডিগার্ড করা হোক। সান্যালকেও সে এবার ভয় দেখাতে চায়। তারপর…

॥ ৩০ ॥

বাবু কিছু বলল না। বংশীর এই যেচে ভবতোষের বাড়ির সামনে গিয়ে কিছু-একটা করা তার পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু শিশির বংশীর কথায় যেভাবে নেচে উঠেছে তাতে বাবু আর কী করতে পারে!

"কখন যাবে?" শিশির জিজ্ঞেস করল বংশীকে।

"আর খানিকটা পরে। দোকান আজ আর খুলে রাখব না। বন্ধ করে চলে যাব। নাও, ততক্ষণে তুমি এই ছেঁড়া কাপড়টাকে টুকরো করে বল করে পাকিয়ে নাও। ভেতরে ইঁটের টুকরো দেবে যাতে ওজন হয়, কাগজ-টাগজ জড়াবে, তারপর কাপড়। গোটা আট-দশ হলেই হবে। বড় বড় বল করবে। বেশি টাইট কোরো না।"

বংশী দোকানের একপাশে জড় করে রাখা কাপড়ের টুকরো, কাগজ, ছেঁড়া মশারির ফালি দেখাল।

বাবু বলল, "ওই ছোট টিনটা কিসের?"

"পেট্রলের। যোগাড় করেছি।"

শিশির কাপড়ের টুকরো, কাগজ টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

বংশী ঠাট্টা করে বলল, "ভবতোষ আমাদের চা খাওয়াবে বলে মনে হয় না, এক কাপ করে চা খেয়ে নিলে ভাল হয় না, বাবুদা?"

মাথা নাড়ল শিশির। "বলে এসো।"

বংশী নস্যির টিপ নাকে গুঁজে বেরিয়ে গেল।

বাবু বলল, "আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা কী করবি তোরা?"

শিশির বলল, "ভবতোষকে বুঝিয়ে আসব, আমরা আছি। তার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি।" তামাশার গলা করে বলল শিশির। তারপর একটু থেমে আবার বলল, "একটা কথা কি জান বাবুদা? ভবতোষ যদি বুঝতে পারে, আমরাও তার পেছনে লেগেছি, লোকটা একটু-না-একটু ঘাবড়াবেই। আর ও যদি ভেবে নেয়, আমরা ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি তা হলে দাপিয়ে বেড়াবে। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, কালকের ঘটনার পর ভবতোষ খানিকটা সাবধান হবেই। ধরো যদি ওর গুণ্ডাটা কাল ধরা পড়ত হেমবাবুর হাতে, কী হত?…ওকে এবার খানিকটা ঘাবড়ে দেওয়া দরকার। এখনই রাইট টাইম।"

শিশিরের কথার মধ্যে বংশী ফিরে এল।

জাম্বো
সার্কাস
পার্ক সার্কাস
ময়দানে

বলল, "চা খেয়ে আমি আমার অস্ত্রটা ঠিক করে নেব।"

"কী অস্ত্র তোমার?"

"দেখতেই পাবে। এ হল দেহাতি যন্ত্র। আগুন ছোঁড়ার।"

বাবু আর শিশির একই সঙ্গে বলল, "সে কী! কোথায় সেটা?"

"শেলফের আড়ালে রেখে দিয়েছি।...একটা গুপ্তিও আমার কাছে আছে।"

"দারুণ," শিশির হাসল। "বংশী তুমি যদি একটা যাত্রা পার্টির পিস্তল যোগাড় করতে পারতে—যাতে শুধু আওয়াজ হত—তা হলেই কেল্লা ফতে হত।"

বংশী বলল, "ভেবো না। আমাদের সঙ্গে একজন থাকবে যে পিস্তলের বাবা।"

শিশির আর বাবু কিছু বুঝল না। বলল, "কে, হেমবাবু?"

"না, হেমবাবু থাকবেন না। আমি লছুয়াকে নিয়ে যাব। সে সঙ্গে থাকবে। তাকে আমি স্টেশনের ওভারব্রিজের কাছে থাকতে বলেছি।"

বাবু বলল, "ভবতোষের বন্দুক কি তোমার লছুয়ার কুড়ুলের চেয়ে মারাত্মক নয়?"

বংশী বলল, "আপনি ভুল করছেন, বাবুদা। ভবতোষ অত কাঁচা কাজ করবে না। বন্দুক চালালে সে পুলিশের হাতে গিয়ে পড়বে। যেচে পুলিশের খপ্পরে সে যাবে না।"

চা খেয়ে গোছগাছ করে বেরোতে খানিকটা সময় গেল। ততক্ষণে একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে চতুর্দিক।

দোকান বন্ধ করে বংশী তালা লাগাল। বলল, "আপনারা স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকুন, বাবুদা। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। আপনারা স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবেন।"

বাবু আর শিশির পা বাড়াল। বংশী উলটো মুখে চলে গেল কোথাও।

দু-একটা জিনিস বাবুদের হাতে গছিয়ে দিয়েছে বংশী। কিন্তু এমন কিছু দেয়নি যা থেকে কোনোরকম সন্দেহ হতে পারে। শিশির তার ঝোলার মধ্যে পেট্রলের ছোট টিন আর স্পিরিট ঢুকিয়ে নিয়েছে। তার পকেটে বিঘত-খানেক লম্বা এক ছোরা। সাবধানেই নিতে হয়েছে। বাবুর হাতে একটা চৌকো বাণ্ডিল, কাগজ দিয়ে মোড়া। বাণ্ডিলের মধ্যে কাপড়ের গোল-গোল বল। অন্য হাতে একটা ছড়ি। আসলে সেটা গুপ্তি। অস্ত্রগুলো বংশীই যোগাড় করেছে। বোধহয় তারই জিনিস। বংশী কয়েকটা রুমাল আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোও বাবুর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বলেছে, কাছে রাখুন—দরকার পড়তে পারে।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে শিশির বলল, "অ্যাডভেঞ্চারের মতন লাগছে; না, বাবুদা?"

বাবু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না।"

"তুমি ভয় পাচ্ছ?"

"ভরসাও পাচ্ছি না।"

শিশির হেসে উঠল। "যখন বংশী প্ল্যান করছিল তখন তো কিছু বলোনি?"

বাবু যেন অস্বস্তি বোধ করল। "ব্যাপারটা এত বুঝিনি।"

"কোনো ভয় নেই।...টর্চটা নিয়েছ তো?"

"নিয়েছি।"

আর কোনো কথা বলল না শিশির।

স্টেশনের ওভারব্রিজে এসে দাঁড়াল দু'জনে। সামান্য আগে কলকাতার গাড়ি চলে গিয়েছে। প্লাটফর্মে তখনও কিছু লোকজন, ফেরিঅলা। আলো জ্বলছে স্টেশন জুড়ে। রেলের টিকিটবাবু ওভারব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে। টিকিট নিয়ে কার সঙ্গে যেন বচসা করছেন।

শিশির একবার আকাশের দিকে তাকাল। অনেক তারা ফুটেছে। মেঘ-টেঘ কোথাও নেই। বাতাসও ঠাণ্ডা। জঙ্গলের মাঠ-ঘাটের গন্ধও নাকে লাগে।

দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বাবুর কিছু চোখে পড়ে গেল, বাবু শিশিরের হাত ধরে টানল, বলল, "ওই দেখ।"

বাবুর চোখের ইশারা - মতন শিশির প্লাটফর্মের দিকে তাকাল। জলের কলের কাছে লছুয়া দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত তার চেহারা। মাথায় অনেকটা লম্বা, চোখে পড়ার মতন; শরীর-স্বাস্থ্য ভীষণ কিছু নয়, অন্তত বাইরে থেকে বোঝা যায় না। লছুয়ার হাত দুটো সত্যিই দেখার মতন, এত লম্বা যে সহজেই নজরে পড়ে। মাথা কামানো। পরনে ধুতি। খাটো

শুধু বনের নয়,
ছোটদের মনেরও শিকারী
বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব গুহ নিজে দারুণ শিকারী। শিকার-কাহিনী লেখাতেও তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর শিকার নিয়ে লেখার মজা হল, একটি ছোট্ট ছেলের চোখের বিস্ময়, মনের অনুভব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা অদ্ভুত অন্তরঙ্গভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি, বড়োদের গাম্ভীর্য নিয়ে দূর থেকে গল্প বলেন না। সেই ছেলেটির নাম রুদ্র, আর এই ক্ষুদে শিকারী যার সাকরেদ, সেই বড়ো শিকারী হলেন ঋজুদা। এতকাল ঋজুদা আর রুদ্রর নানান গল্পই আমরা শুনেছি, এ-জঙ্গলে, ও-জঙ্গলে, এমন-কি আফ্রিকার গুগুনোগুম্বারের দেশের গল্পও, নতুন বই 'টাঁড় বাঘোয়া'য় বুদ্ধদেব গুহ শোনালেন তাঁর নিজের ছেলেবেলারই এক দুর্দান্ত শিকারকাহিনী। এ-গল্পেরও জবাব নেই।

বুদ্ধদেব গুহের বই :

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৮·০০
মউলির রাত ৫·০০
বনবিবির বনে ৭·০০
গুগুনোগুম্বারের দেশে ১০·০০
টাঁড়বাঘোয়া ৮·০০

আরো অনেক বই

সত্যজিৎ রায়ের বাদশাহী আংটি ৮·০০ এক ডজন গপ্পো ১২·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৮·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৭·০০ সোনার কেল্লা ৭·০০ বাক্স-রহস্য ৭·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৭·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৭·০০ আরো একডজন ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৮·০০ ফটিকচাঁদ ১০·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৮·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ হত্যাপুরী ৮·০০ আরো বারো ১২·০০ পাপুর (সুব্রত সরকার) পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ১০·০০ পাপুর বই ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

ধুতি। মালকোঁচা মেরে পরেছে। গায়ে একটা ফতুয়া। কোমরে গামছা জড়ানো।

শিশির এই লোকটাকে আগেও দেখেছে। কিন্তু ভাল করে নজর করেনি। বংশীর কাছে লছুয়ার কথা শোনার পর তার কেমন কৌতূহল হয়েছিল।

শিশির বলল, "ওর কুড়ুল কই?"

বাবু বলল, "বোধহয় শুধু হাতে এসেছে।"

সামান্য পরেই বংশীকে চোখে পড়ল। বংশী বুকিং-অফিসের পাশ দিয়ে লাইন টপকে প্লাটফর্মে উঠেছে। লছুয়ার প্রায় কাছাকাছি এসে সে যেন কিছু বলল তাকে। তারপর ওভারব্রিজের দিকে তাকিয়ে শিশিরদের খুঁজতে লাগল।

শিশির হাত তুলে নিজেদের দেখাল।

বংশী ডাকল তাদের।

শিশির বলল, "চলো, বাবুদা।"

প্লাটফর্মে নেমে জলের কলের কাছাকাছি আসতেই বংশী বলল, "চলো, আর দেরি করব না। আমরা লাইনের পাশ দিয়ে খানিকটা যাব, তারপর ডাইনে নেমে রাস্তা ধরব। কাঁচা রাস্তা। তবে খারাপ নয়, ভবতোষের গাড়ি যায়।"

শিশির আর বাবু লছুয়ার দিকে তাকাল।

বংশী বলল, "ও আসবে। আমাদের খানিকটা পেছনে থাকবে।"

"ওর কুড়ুল কই?"

"আছে," বংশী হাসল। "লুকিয়ে রেখেছে। নাও, চলো।"

"তোমার যন্ত্রটা কোথায়?"

"এই তো...।" বংশী পিঠের দিকে আড়াল করে রেখেছিল তার যন্ত্র।

পা বাড়াল বংশী। লছুয়াকে বলল, "তু থোড়া ঠাহর যা।" বলে হঠাৎ বাবুকে বলল, "একটা সিগারেট দিন তো বাবুদা, লছুয়াকে গরম করে দি।"

বংশী বাবুর কাছ থেকে সিগারেট দেশলাই চেয়ে নিয়ে লছুয়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিছু যেন বোঝাল লছুয়াকে, বুঝিয়ে ফিরে এল।

প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে লাগল তিনজনেই। লছুয়া থাকল খানিকটা পেছনে।

হাঁটতে হাঁটতে বংশী বলল, "ভবতোষের বাড়িতে পাহারাদার আছে। তবে সেই পাহারাদার চব্বিশ ঘণ্টা যে বাইরের দিকে নজর রাখবে তা মনে হয় না। এ-দিককার সব বড়লোকদের বাড়িতেই দরোয়ান থাকে, না-হয় মালি। তারা ফাঁকিবাজ। ভবতোষের বাড়ির পাহারাদার অতটা ফাঁকি মারতে পারবে না। তবু সে-বেটা আমাদের আগেভাগে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।"

"ওর তো একটা ওয়াচ পোস্টের মতন ব্যবস্থাও আছে," বাবু বলল।

"তা আছে। কিন্তু সেখানে সারাদিন লোক বসে থাকে নাকি? কোনো কারণ নেই থাকবার। ওটা ভবতোষের শখ হয়তো, কিংবা ধরুন, লোককে ভড়কি দেবার চেষ্টা, নিজের প্রেস্টিজ বাড়ানো।"

"তা জানি না। তবে আমাদের সেদিন কেউ দেখেছিল।"

"আচমকা দেখে ফেলতে পারে বাবুদা, তার জন্যে ওই টঙে ওঠার দরকার করে না। ও-বাড়ির ছাদ থেকেও এই ফাঁকা জায়গার চারপাশ দেখা যায়। তা সে দিনের বেলায়, এই অন্ধকারে নয়।...নিন, এবার ডান দিক দিয়ে গড়গড়িয়ে নীচে নামুন, রাস্তায়।" বলে বংশী টর্চের আলো দেখাল।

সামান্য ঢালু পায়ে-চলা সরু পথ। তিন জনেই রাস্তায় নেমে এল। টর্চ নিবিয়ে দিল বংশী। বলল, "আমরা কিন্তু আর টর্চ জ্বালব না। নেহাত দরকার পড়লে যদি জ্বালতেও হয়, কাচের ওপর হাত চাপা দিয়ে জ্বালব।"

শিশির বলল, "বংশী, আমাদের আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে হবে? সামনের দিক দিয়ে না পেছনের দিক দিয়ে?" বলে শিশির হাসল। তারপর নিজের মনেই বলল, "এ যেন ভবতোষের দুর্গ আক্রমণ!"

বংশী বলল, "পাশাপাশি জায়গা থেকে। ভবতোষের বাড়ির একটা দিকে মাটির উঁচু ঢিবি আছে, পাথরের চাঁই পড়ে আছে বড়-বড়। আমরা সেখান থেকেই অ্যাটাক করব।"

"মানে, তোমার যন্ত্র থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়বে?" শিশির ঠাট্টা করেই বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে পাঁচিল টপকে ভেতরে গিয়ে পেট্রল ছড়িয়ে আসতে হবে।"

শিশির অবাক হয়ে বলল, "অত উঁচু পাঁচিল টপকাবে কে?"

"লছুয়া," বংশী বলল।

(ক্রমশ)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

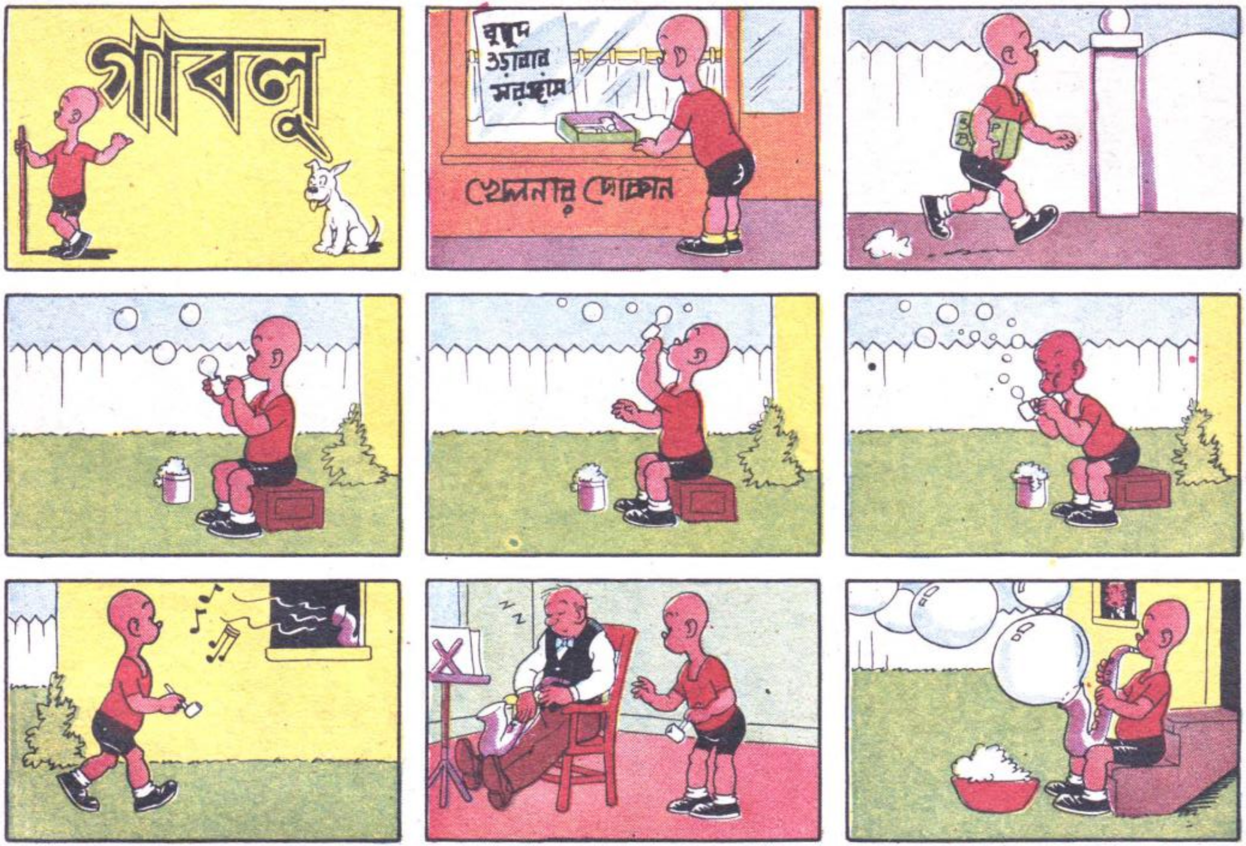
গাবলু
বুদ্বুদ ওড়াবার সরঞ্জাম
খেলনার দোকান

আরো কেলেঙ্কারি

বাচস্পতি

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,"কেলোর কীর্তি? সেটা আবার কোথায় হচ্ছে?"

হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "কথা কী হচ্ছিল? না আমাদের শিষ্ট চলিত বাংলায়।" বলেই বিরক্তি-সূচক 'আহ্' করে উঠলেন, বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাত দিয়ে অধৈর্য হয়ে ঘুষি মারলেন একটা। বললেন,"এই 'শিষ্ট' কথাটা এখানে আমার একদম ভাল লাগে না। আসলে যখন পণ্ডিতরা কথাটা বানিয়েছেন তখন তাঁরা বিশ্বাস করতেন,একটা 'ভাল' ভাষা আছে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা, বাকি ভাষাগুলো, অর্থাৎ বাকি উপভাষাগুলো সে-অর্থে ভাল নয়। সেগুলো 'অ-শিষ্ট' ভাষা। ক্যান রে দাদা, সে উপভাষাগুলো কি বানের জলে ভেসে এসেছে?"

ভণ্টু বলল,"হ্যাঁ, তুমি তো সেদিন বলছিলে, কোনো ভাষাই অন্য কোনো ভাষার চেয়ে ছোট বা বড় নয়। সব ভাষাই নিজের নিজের এলাকায় মূল্যবান—"

"এটা কি আমাদের দেশ বলেই ভাষায় ভাষায় এ-রকম একটা জাতিভেদপ্রথা তৈরি হয়েছিল নাকি রে? একটা ভাষা ব্রাহ্মণ, আর বাকি সব ভাষা শূদ্র?" ভণ্টুর বাবা একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, বিদেশেও একসময় ভাষার জাতিভেদ মেনেছে লোকে। রাজধানীর ভাষা, পুরোত-পণ্ডিতদের ভাষা—সব কুলীন বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু এখন তো ওসব মানি না আমরা। ঐ 'শিষ্ট-ফিষ্ট' থাক, আমি স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাই বলব।" হিগিনকাকু জেদ ধরলেন যেন।

ভণ্টু বলল, "ঠিক আছে কাকু, এখন এই স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় কী কেলেঙ্কারি হচ্ছে?"

হিগিনকাকু ভণ্টুর হাত টেনে নিয়ে 'হ্যাণ্ডশেক' করলেন, বললেন,"ঠিক সুতোটা ধরিয়ে দিয়েছিস তো? আরেকটু হলেই খেই হারিয়ে ফেলতুম। শব্দের ঐ গোড়ার—" বলে একটু কেশে নিয়ে বলতে লাগলেন, "শব্দের ঐ গোড়ার সিলেব্‌লে ঝোঁক পড়ার ফলে উচ্চারণের জোর পরের দিকে কমে যাচ্ছে, তাই তো? তার ফলে আমরা দেখলুম যে, শব্দের গোড়ায় না থেকে 'অ' যদি আর কোথাও থাকে তাহলে সেটা 'ও' হচ্ছে। আগে তার উদাহরণ দিয়েছি। যেমন 'হরণ' - এ রোন্—হরোণ্। তেমনি কম্বল (কম্‌বোল), কলম (কলোম), তরল (তরোল), অশান্ত (অশান্তো) ইত্যাদি। এতে ঠোঁটের কুড়েমিতে'অ'টা 'ও' হচ্ছে। কিন্তু এই কুড়েমি এমনই দাঁড়াচ্ছে যে, কোথাও কোথাও 'অ' বা অন্য স্বরধ্বনি থাকলে মুখ তাকে উচ্চারণই করছে না। বলছে,অদ্দূর টানতে পারব না দাদা,যদি কিছু মনে না করো, শব্দটাকে একটু ছেঁটে দিই! তখন সংস্কৃতে যা ছিল 'ফল'(ফ্+অ+ল্+অ), সেটা বাংলায় হয়ে গেল (ফ্+অ+ল্) । অর্থাৎ শেষের 'অ'-টাকে উৎখাত করে দেওয়া হল। (জ্+অ+ল্+অ) হল (জ্+অ+ল্),(আ+ক্+আ+শ্+অ) হল আকাশ্। এটা ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারবে। সেখানে শব্দের শেষে অ- ধ্বনি প্রায় সর্বত্র আছে। শুধু তাই নয়, বাংলায় 'গামোছা' শব্দটা যে 'গাম্‌ছা' হচ্ছে, জানালা হচ্ছে 'জান্‌লা'—তার মূলেও ঐ গোড়াকার ঝোঁক। এরই ফলে কিছু বাঙালির মুখে 'বলেছি' হয় 'বলিচি','শুনেছি' হয় 'শুনিচি'। শুধু তাই নয়, 'খ' হয়ে যায় 'ক' অনেক শব্দে—যেমন একন,ওকানে,তকন। ঝোঁক পড়ছে গোড়ায়, মুখ দম ফুরিয়ে ধ্বনি বদলে দিচ্ছে, ধ্বনি ছেঁটে ফেলছে। দ্যাকো দিকিনি কাণ্ড!"

বাবা বললেন, "কেলোর কীর্তিই বটে।"

(ক্রমশ)

চম্বলের চোখে ঘুম নেই

প্রসাদ

বাবা টেলিফোন রেখে দিলেন।

"Can you guess who I was talking to?" he asked Chambal who had just entered the room.

How could Chambal guess to whom Father was talking over the phone?

"All right," Father said, "I'll save you the trouble of guessing. It was Bimal Krishna Kumar."

Chambal looked blank. Obviously the name meant nothing to him.

Father said, "Doesn't the name sound familiar? Why, you're always reading books written by him. Detective stories. Can you guess now? But he writes under a pen name."

"Meghnad!" exclaimed Chambal.

"That's right." Father said. "A common friend brought him to me the other day. A nice man. How are his books? Dripping with blood, I expect?"

"Oh, they're good, Dad. There were six murders in the one I've just finished, All were solved by Adhiraj Roy. He's the cleverest detective in the world."

"I don't know about that. But his creator must be a very clever writer, indeed, for his books bring him a great deal of money. He's on the look out for a very good flat in a very exclusive neighbourhood."

"But it must be very dangerous to have a lot of money, Dad. In his stories the richest men are killed in the most horrible manner."

"Are they, indeed? There must be dozens of writers, and quite good ones too, who envy Meghnad his success. But I don't suppose they'd like to murder him."

সে-রাত্তিরে চম্বল মেঘনাদেরই লেখা একখানা দারুণ ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিল বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। মা এসে একবার তাগাদা দিয়ে গেছেন, কিন্তু ঘুম কি আর আসতে চায়? চম্বল নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে পড়ছিল:

The door was locked from inside. Adhiraj struck it a heavy blow. Then he gave it a hard kick. The door stood firm. He called for help. A stout-looking man stepped forward. Adhiraj and he together put their shoulders to the door and pushed. It gave at last. Adhiraj stepped in and held his breath. Kumar Nayanendra **Narayan** was lying in a pool of blood. "Who could have done this to him?" Adhiraj wondered. "Did somebody bear him a grudge, or was it for his property?"

লক্ষ করো:

I'll save you the trouble of guessing.
His books bring him a good income.
Many writers envy him his success.
He struck the door a heavy blow.
Who bore him a grudge?

গাবলু

বাঘা

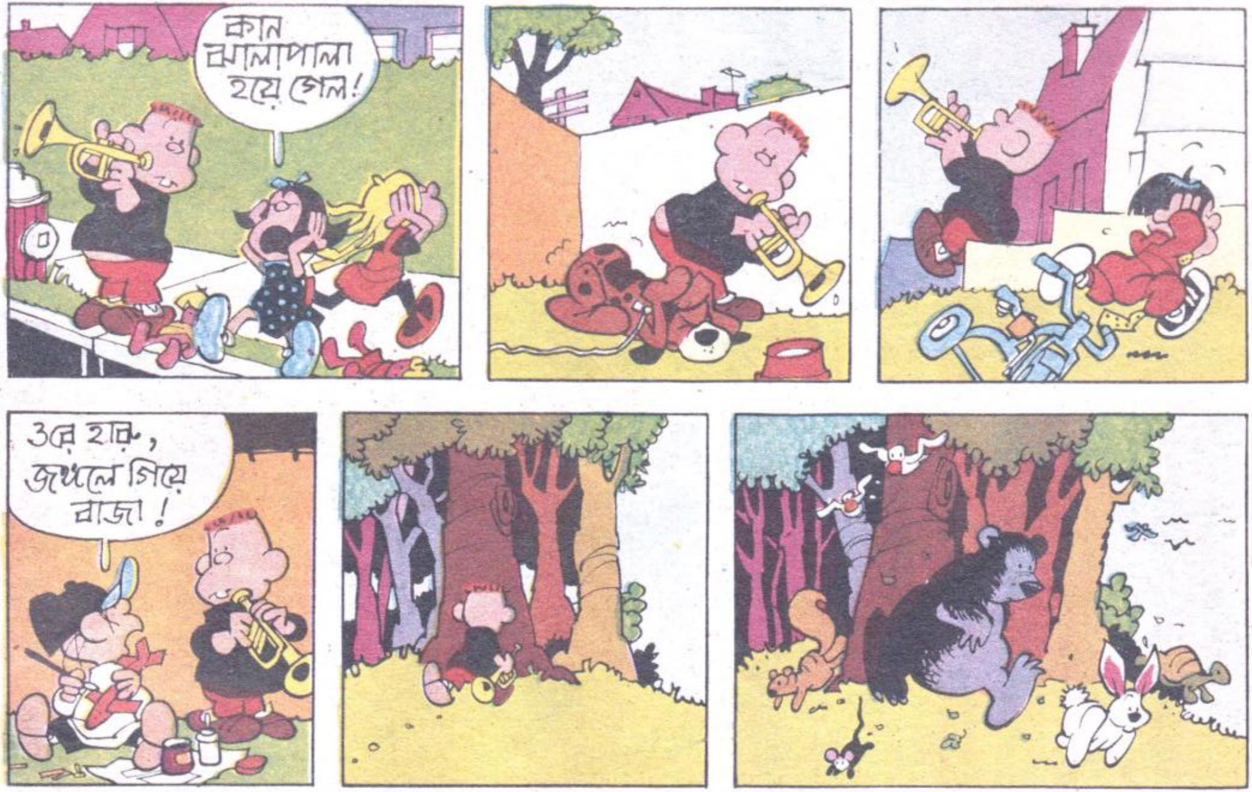

আঁকো

ডিম থেকে পাখি

একসঙ্গে সবাই মিলে খেতে বসেছে। সব পাখিই কিন্তু ডিম থেকে বেরিয়েছে। অপেক্ষা করো, ওরা খাওয়া শেষ করে তোমার দিকে ফিরবে। যদি না ফেরে পরের সংখ্যায় দ্যাখো।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

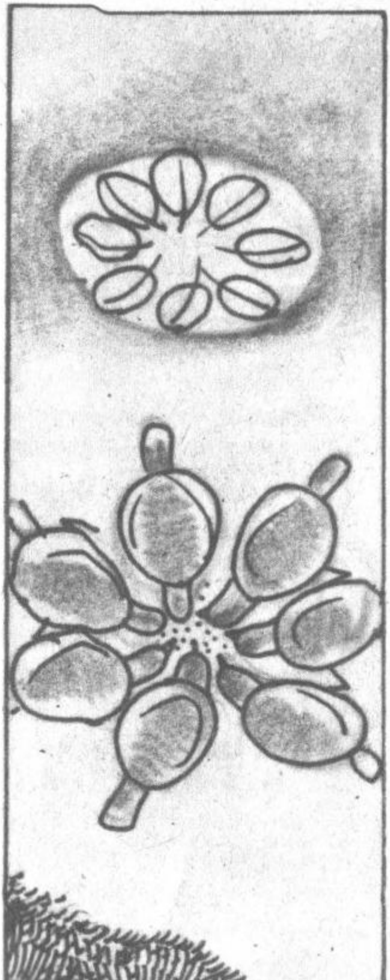

শেখো

কার্ডবোর্ডের কাজ: বড় খেলনা-সোফা

এ-কাজের জন্য একটু মোটা বোর্ড বেছে তাকে সমান ১২ ভাগে ভাগ করে নিয়ে, 'ক' নকশার ওপরের কালো কোণ দুটি গোল করে কেটে, ২নং চৌকো দুটি (চ ও ছ) অংশের লাইন-বরাবর চিরে নিয়ে 'খ' নকশা-মাফিক ভাঁজ করলেই দিব্যি আরামদার বড় সোফা তৈরি।

জেনে রাখো—(১) ভাঁজ দেবার সময় ঠিক-ঠাক সমানভাবে না হলে উঁচু-নিচু হবে। (২) বড় কাজ করতে চাইলে বোর্ডের কাজ শেষ হলে সমস্ত কিছু মিলিয়ে করার জন্য পছন্দমতো রঙ করে নিতে পারো। (৩) ফেবরিক বা ক্রাইলিন রঙ ব্যবহার করলে ওঠবার ভয় থাকবে না।

—কারিগর

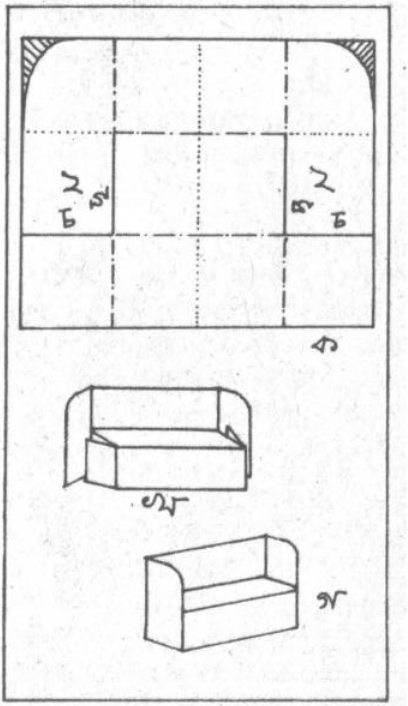

শীত পড়ে গেল

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে এখনই আপনার
বেশী দরকার

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল

ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় অপরিহার্য

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে শীতেই আপনার ত্বক স্পর্শ-কাতর হয়ে ওঠে বেশী। উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বাচ্চা আর শিশুরাই হয় বেশী আক্রান্ত—গায়ের চামড়া হয়ে ওঠে শুকনো, ফাটা-ফাটা আর খসখসে। শীতের মাসগুলোয় ত্বকের এইসব সমস্যায় একমাত্র সুরাহা কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। এতে আছে ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য তিনটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন (ই,এ এবং ডি)।

শীতে কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের খসখসে, ফাটা-ফাটা ভাব দূর হবে, আর ত্বকের চেহারাও হয়ে উঠবে রেশমের মতো মসৃণ।

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। শীতে আপনার সঙ্গী। আপনার ছেলে-মেয়ের ও পরিবারের সকলের সঙ্গী।

মোলায়েম বেস-নির্ভর এতে আছে অলিভ অয়েল, ল্যানোলিন ও চন্দন তেল

Dey's

দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

৬০ ও ১৮০ এম.এল. প্যাকে পাবেন

PX/KMO/B-4B/81/0

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে,

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহ'র করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU-220-1810 BG